প্রেমের ট্রাজেডি

চিরঞ্জীব সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭০ সন

প্রকাশক
শ্রী সুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রী গণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রী বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

শ্রীমান গোবাচাঁদ বসু

কল্যাণীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই

কঙ্গোরিলা
বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
লস্ট আটলান্টিস
পিরামিড রহস্য
প্ল্যানেট মিস্ট্রি
সিক্রেট স্পাই
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা
অরিজিন্যাল জেমস বন্ড

ভূমিকা

মহাকাশ নিয়ে গবেষণার দিকে মানুষ মন দিয়েছে। এ নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী গবেষণা চলছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে, নানারকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, নতুন ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

একটা সমস্যা হচ্ছে জীবাণুর সমস্যা। কোনো বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা আরও দূর আকাশে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে জীবাণু, যাদের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যতীত অন্য কোনো মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না যাদের নাম ভাইরাস তারা মহাকাশে বিচরণ করছে।

সব ভাইরাস যে ক্ষতিকারক তা নাও হতে পারে তবুও ক্ষতিকারক ও মারাত্মক ভাইরাসও তো থাকতে পারে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এমনই একটা ঘটনা ঘটল এবং এমনই সাংঘাতিক যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য গবেষণার বিষয় অনেক সময় গোপন রাখা হয়। এ ব্যাপারটিও আমেরিকা গোপন রাখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাঘা বাঘা সাংবাদিকদের দেশে ঘটনাটি গোপন রাখা গেল না। অনেকটাই ফাঁস হয়ে গেল তবে যা ফাঁস হল তা প্রধানতঃ আমেরিকাতেই আবদ্ধ রইল। বিদেশের খবরের কাগজ, রেডিও বা টি-ভি-তে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা সামান্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ঘটনা সম্বন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে এই বই।

ঘটনাটি যে কি তা বইখানি পড়লেই জানতে পারা যাবে। বাস্তব ঘটনা যে কল্পনা অপেক্ষা কতদূর রুদ্ধশ্বাস ও উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

—প্রকাশক

যত কাণ্ড অ্যামেরিকাকে নিয়ে।

নিউ মেকসিকো স্টেটের কোনো এক সমতলভূমিতে একটা লেক ছিল। সে লেক প্রায় একশত বছর আগে শুকিয়ে গেছে। জমি খটখটে শুকনো। এখানে যে একদা একটা বিরাট জলাশয় ছিল তা বোঝাই যায় না।

পচা খড় বা পাতার ওপর রাতারাতি যেমন ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে তেমনি সেই শুকনো লেকের ডাঙায় আকাশের মাথা ফুঁড়ে সাতাশটা বিরাট অ্যানটেনা সিরিজ বসানো হলো।

প্রায় মরু সদৃশ অঞ্চলে এতো অ্যানটেনা কি হবে? কিসের অ্যানটেনা? টেলিভিসনের? না। তবে?

মানুষ শুনতে চায় মহাশূন্যের শব্দ কিংবা ভিন গ্রহ থেকে পাঠানো কোনো শব্দ-সংকেত। তাই ওখানে বসানো হয়েছে ভি এল এ রেডিও টেলিসকোপ। ভি এল এ হলো "ভেরি লার্জ অ্যারে" শব্দ তিনটির প্রথম অক্ষর। অ্যানটেনাগুলি ঐ রেডিও টেলিসকোপেব।

যন্ত্রগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দূব আকাশেব শব্দ শুনতে পেয়ে মানুষ হয়তো কোনদিন আমাদের কবির ভাষায় বলে উঠবে "আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি তোমারই গান।" সেদিন এখনও আসে নি তবে নাকি আসবার আশা আছে।

সাড়ে তিন হাজার একর জমির ওপর আশি কোটি ডলার খরচ করে ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের আদর্শে এই অ্যানটেনাগুলো বসানো হয়েছে। ওয়াই-এর দুটো বাহুর প্রতিটি তেরো মাইল লম্বা আর লেজটি এগারো মাইলের কিছু বেশি।

আকাশের নানারকম শব্দ সূক্ষ্ম যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরে কমপিউটারের সাহায্যে সেই সব শব্দ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শব্দ বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে দিনের নীল আকাশ বা রাত্রেব কৃষ্ণপক্ষের মিশকালো আকাশ বা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত আকাশ মোটেই মূক নয়,

রীতিমতো বাচাল।

অন্য গ্রহ থেকে কোনো সংকেত ধরা পড়েছে কি না তা জানা যায় নি বা প্রকাশ করা হয় নি। তবুও কিছু ত পাওয়া গেছে। যেমন মহাশূন্যে কোথায় যেন জ্বলন্ত গ্যাসের একটা মহাসাগব রয়েছে, সেই সমুদ্রে নানা রকম গ্যাস নাকি হরদম পাক খাচ্ছে।

সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বিচিত্র কোয়াসার-এর, এক সময়ে যাকে নক্ষত্র বলে ভুল করা হয়েছিল। এই কোয়াসার কখনও খুব কম সময়ের ব্যবধানে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে আবার নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। এই কোয়াসাব থেকে শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ জেগে উঠছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এর দীপ্তি দ্বিগুণ হয়ে যায় আবাব একদিনে আকারে বেড়ে তিন গুণ হয়ে যায়। প্রচণ্ড তেজী ইলেকট্রন কণা আলোর সমান গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপরই হয়তো বয়ে চলেছে বেতার রশ্মি আর আলোর ঝর্ণাধারা।

কখনও পাওয়া যাচ্ছে মহাকাশ জুড়ে মৃদু শব্দ, সে শব্দ নাকি আজকের নয়। লক্ষ বছর আগে কোথায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল তারই আওয়াজ আজ পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে।

নিউ মেকসিকো স্টেটে এই যে ভি-এল-এ স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এটি পাহারা দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে।

মহাশূন্যের নানা রহস্য জানবার জন্যে এবং পৃথিবী থেকে যে সব অনুসন্ধানী রকেট বিভিন্ন গ্রহের দিকে পাঠান হচ্ছে বা যেসব স্যাটেলাইট নানা কাজে আকাশে পাঠানো হচ্ছে তাদের গতিবিধির ওপর নজর বাখতে বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা তাদের প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ কবতে পাশাপাশি নিউ মেকসিকো, অ্যারিজোনা বা টেকসাস স্টেটে ছোট বড অনেক স্টেশন ও অবজারভেশন পোস্ট স্থাপিত হয়েছে।

সে এক বিবাট ব্যাপার। আয়োজনও বিরাট। সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চালাতে হয় ও চলতে হয় তাই সর্বত্র কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। সেদিকে অবশ্য শৈথিল্য নেই।

একটি বিশেষ রাত্রির কথা বলছি।

অ্যারিজোনায় নবগঠিত একটি ক্ষুদ্র কলোনির কাছে ছোট্ট একটা পাহা-

ড়ের মাথায় একজন লোক হাতে একটি শক্তিশালী দূরবীন নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে একজন সঙ্গী আছে।

একবার এখানে দাঁড়াচ্ছেন। একবার ওখানে, চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছেন।

লোকটির নাম লেফটেনাণ্ট মাইকেল হারভে। প্রচণ্ড শীত। দু'জনেরই আপাদমস্তক গরম পোশাকে আচ্ছাদিত। তবুও যেন শীতকে আটকানো যাচ্ছে না। সবই ঢাকা শুধু নাকের দুই গর্ত ছাড়া কারণ সেই দুটি গর্ত বন্ধ করা সম্ভব নয়। স্টেনলেস স্টীলের ব্লেডের চেয়েও ধারালো সেই হাড়কাঁপানো বাতাস নাকের সেই গর্ত দুটি দিয়ে শরীরের ভেতর ঢুকে হার্ট, লাংস, স্টম্যাক, লিভার সব কিছু যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

যে ক্ষুদ্র কলোনির ওপর মাইকেল হারভে তার দূরবীন ঘুরিয়ে দেখছে সেই কলোনির রাস্তা মাত্র একটি তবে বেশ চওড়া, দুপাশে খান কুড়ি কাঠের বাংলো।

এই কলোনির আশেপাশেই নাকি একটা ছোট স্যাটেলাইট ল্যাণ্ড করবে। স্যাটেলাইটটা বায়ুমণ্ডলের ওপারে পাঠানো হয়েছিল কয়েকটা তথ্য সংগ্রহের জন্য। স্যাটেলাইটে স্বয়ংক্রিয় যে যন্ত্র ও ক্যামেরা বসানো আছে তাতে সেই সব তথ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা।

কাছেই ভি-এল-এ রেডিও টেলিফোনে মাঝে মাঝে একটা মৃদু শব্দ-সংকেত শোনা যায়। সেই মৃদু শব্দ-সংকেতের উৎস সন্ধানের জন্যেই ঐ স্যাটেলাইটটি ঊর্ধ্বাকাশে পাঠানো হয়েছে।

স্যাটেলাইটটি ল্যাণ্ড করলে বিপ্ বিপ্ আওয়াজ হবে এবং তখনই জানা যাবে যে উনি ভূতলে অবতরণ করেছেন।

মাইকেল হারভে যেখান থেকে নজর রাখছেন সেখান থেকে ঐ বিপ্ বিপ্ ধ্বনি শোনা যাবে না। তারজন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তবুও মাইকেল হারভে চোখে দূরবীন লাগিয়ে কি দেখছিলেন তা অজ্ঞাত।

একটা মোটর ভ্যান আনা হয়েছে। তার ভেতর নানারকম যন্ত্রপাতি বসানো আছে। তারই মধ্যে একটি যন্ত্রে স্যাটেলাইট প্রেরিত বিপ্ বিপ্ সংকেত ধরা পড়বে এবং আর একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র দ্বারা জানা

যাবে স্যাটেলাইটটি কত দূরে ও কোন্ দিকে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য ওটিকে স্যাটেলাইট বলছেন না, তাঁরা বলছেন স্কুপ ক্যাপস্যুল।

মোটর ভ্যানটির এঞ্জিন চালু রাখা হয়েছে। এঞ্জিন বন্ধ রাখলে এই ঠাণ্ডায় এঞ্জিন আর চালু করা যাবে না হয়তো। ভ্যানের মাথায় একটি অ্যান্টেনা ঘুরছে। ভেতরে লাল আলো জ্বলছে। লাল আলো থেকে বাইরে বেরোলে চোখ ধাঁধিঁয়ে যায় না। লাল আলোয় ভেতরের যন্ত্র-পাতি ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের গায়ে যা লেখা আছে এবং ডিজিট্যাল ক্লকের চলন্ত সংকেতগুলি সবুজ দেখাচ্ছে।

ভ্যানের ভেতরে বসে আছে পুরু হাইনেক সোয়েটার ও মাথায় কান-ঢাকা টুপি পরে ইলেকট্রনিক টেকনিসিয়ান টম পিয়ার্স।

মাইকেল হারভে ভ্যানে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে টম পিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করল আমরা ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করছি ত? তুমি পজিশন চেক করে নিয়েছ ত?

টম পিয়ার্স তখন একটা ম্যাপের ওপর কি দেখছিল আর মাঝে মাঝে আর একটা যন্ত্রের রিডিং দেখে ম্যাপের ওপব লাল পেনসিল দিয়ে ফুটকি আঁকছিল।

ম্যাপ থেকে মুখ না তুলে টম বলল, আমরা ঠিক জায়গাতেই পজিশন নিয়েছি।

ক্যাপস্যুলটা কি জন্যে আকাশে পাঠানো হয়েছিল তা এরা দু'জনেই কেউ জানে না। তাদের ওপর নির্দেশ আছে যে ক্যাপস্যুল ল্যাণ্ড করলে সেটিকে তারা তুলে নিয়ে যাবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভ্যানের ভেতর এমন একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো আছে যে প্রথম বিপ্ বিপ্ শব্দ শোনা গেলেই সময়টা সেই যন্ত্রে বা ঘড়িতে রেকর্ড হয়ে যাবে।

ম্যাপ দেখতে দেখতে পেনসিল থামিয়ে টম পিয়ার্স কান খাড়া করে কি শুনেই মাইকেল হারভেকে চুপ করতে ইসারা করে সেই স্বয়ংক্রিয়

ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো, ক্যাপস্যুল ল্যাণ্ড করলো, টাইম টোয়েন্টি টু ফিফটিন, পজিশন রাইট পয়েন্ট।

এবার দু'জনকেই ভ্যান থেকে বেরিয়ে ক্যাপস্যুলটা তুলে এনে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। প্রচণ্ড শীত। বাইরে বেরোবার চিন্তাতে দু'জনেই কাতর। তাছাড়া ওরা ভীষণ ক্লান্ত। তারা সেই সকালে ভ্যাণ্ডেন-বার্গ এয়ারফোর্স স্টেশন থেকে যাত্রা করে সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে এখানে পৌঁছেছে। জায়গাটার নাম মেলোটাউন। অ্যারি-জোনা স্টেটে এর অবস্থান।

নামেই টাউন। টাউন ত নয়, একটা স্টেশন। জনসংখ্যা মাত্র আটচল্লিশ বা কিছু বেশি। এখান থেকে বারো মাইল দূরে 'ইএসএ' অর্থাৎ "এস্টিমেটেড সাইট অফ অ্যারাইভাল" পয়েন্টে ওদের যেতে হবে। এদের সব কাজই সাংকেতিক ভাষায় চলে। দু'একটা সংকেতের ত উল্লেখ করা হয়েছে, পরে আরও পাওয়া যাবে।

রেল স্টেশন ভ্যাণ্ডেনবার্গ কয়েকটা কমপিউটারের সাহায্যে 'ইএসএ' পয়েন্ট ঠিক করে রেখেছে। এদের অনুমান সব ক্ষেত্রে সঠিক হয়েছে, বড় জোর একশত মিটারের তফাত হয়।

স্যাটেলাইটটা জমিতে পড়বার সময় সেটা ছোট একটা অগ্নি-গোলকের মতো দেখাবে এবং সেই উজ্জ্বল বস্তু মাটিতে পড়ার সময় স্থানীয় ব্যক্তিরা দেখতে পেয়ে সোরগোল তুলবে। তাদের জিজ্ঞাসা করেও জানা যায় বস্তুটা কোন্ দিকে বা কোন্খানে পড়লো।

এখন কোনো গোলমাল শোনা গেল না। মাইকেল হারভে আর পিয়ার্স ভাবল প্রচণ্ড শীতে কে আর ঘরের বাইরে থাকবে? তাই কোনো শব্দ শোনা যায় নি।

ব্যাপার কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা একটু পরে জানা যাবে।

দু'জনে ভ্যান থেকে বেরিয়েই কাঁপতে লাগলো। পিয়ার্স ত শরীর গরম করবার জন্যে স্কিপিং করার মতো নাচতে লাগলো।

চারদিক শান্ত। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মেলোটাউনের বাইরে সব অন্ধকার। সামনে যে মোটেল আর পেট্রল ফিলিং স্টেশন দেখা যায়

তারা বাইরে একটা নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। কয়েক মাইলের মধ্যে রাত্রি যাপনের জন্যে মোটেল আর পেট্রল ভরবার জন্যে ফিলিং স্টেশন নেই।

অন্ধকার মানে কোথাও আলো জ্বলছে না কিন্তু আকাশে চাঁদ আছে। অল্প কুয়াসা থাকলেও চাঁদের আলোয় পথ দেখে বেশ যাওয়া যায়। ওরা এগিয়ে চললো। ক্যাপস্যুলটা তুলে আনতে হবে। ইএসএ পয়েন্ট দেখে এসেছে।

সহসা মাইকেল হারভে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, টম আকাশে ওগুলো কি উড়ছে?

টম পিয়ার্সও বুঝতে পারল না, আন্দাজে বললো, শকুনি নয়ত চিল।

মাইকেল হারভের আবার প্রশ্ন, এত রাত্রে মেলোটাউনের ওপর ওরা চক্কর মারছে কেন? শকুন চিল ত আসে গরু মোষ মরলে?

বাতাস বইছে। হাত আড়াল করে লাইটার ধরে মাইকেল হারভে সিগারেট ধরালো। সিগারেটে দু'চারটে টান দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে শহরেব দিকে একবার চেয়ে দেখল। শহরটা যে বেঁচে আছে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কুকুরেব ডাক বা শিশুর ক্রন্দন কিছুই নয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত টেলিভিসনের আওয়াজ শোনা যায়, এখন তাও শোনা যাচ্ছে না।

সিগারেটটা ঠিক জমলো না। মাইকেল সিগারেটটা ফেলে দিল, চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে টম পিয়ার্সকে বললো, শীত হলেও কোনো শহর এত শান্ত মনে হয় না, এ যেন ডেড সিটি, ভালো মনে হচ্ছে না, চল তো, একবার দেখে আসি।

আকাশে যে ক্যাপস্যুলটা ছাড়া হয়েছিল এবং যেটা একটু আগে মেলো-টাউন থেকে একশত মিটার দূরে পড়েছে সেই ক্যাপস্যুল বিষয়ে যে প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল "প্রজেক্ট হাইড্রা"।

প্রজেক্ট হাইড্রা পরিচালনা করা হচ্ছে তিনশ' মাইল দূরে ভ্যাণ্ডেনবার্গ শহরে মিশন কন্ট্রোল অফিস থেকে। অফিসের কর্তার নাম ড্যান বেনেট।

মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, জীবন বিজ্ঞান সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এমন কি অতি আধুনিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিকস কলাকৌশল প্রয়োগে তিনি একজন দক্ষ বিজ্ঞানীরূপে সুপরিচিত। এদিকে সাহিত্য ও চারুশিল্পেও তাঁর আগ্রহ কিছু কম নয়। এক কথায় একজন সর্বগুণসম্পন্ন সম্পূর্ণ চৌকস মানুষ।

মাসে তিনি একবার নাইট ডিউটি করেন। কোন্‌দিন নাইট ডিউটি করবেন সেই বিশেষ দিনটি তিনি নিজেই বেছে নেন। যেমন আজ রাত্রিটি তিনি বেছে নিয়েছেন কারণ আজ স্যাটেলাইট হাইড্রা ল্যাণ্ড করবে।

টেবিলের ওপর দুই পা তুলে দিয়ে ড্যান বেনেট একখানা বিজ্ঞান পত্রিকার একটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পড়ছেন। শহরে জনসংখ্যা যত বাড়ছে, শিল্প যত বাড়ছে, গাছ তত কমছে, পরিবেশ তত দূষিত হচ্ছে। ফলে মানুষের ভাগে কতটা অকসিজেন কমছে সেই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ তিনি পড়ছেন।

ঘরে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেণ্ট আলো জ্বলছে, ড্যান মাঝে মাঝে ব্ল্যাক কফি খাচ্ছেন, মৃদুস্বরে টেপ রেকর্ডার থেকে সঙ্গীত বাজছে। তবুও মাঝে মাঝে মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, কান যেন কি শুনতে চাইছে।

দেওয়ালে একটা ছোট লাউড স্পিকার লাগানো আছে। সেই স্পিকার মারফত তিনি একটা বার্তা আশা করছেন। বার্তাটি আসবে মেলোটাউন থেকে। বার্তা পাঠাবে মাইকেল হারভে।

মিশন কণ্ট্রোলে বারোজন লোক নাইট ডিউটি করছে। মাইকেল হারভে যে বার্তা পাঠাবে সে সম্বন্ধে কিছু কাজ করতে হবে, এইজন্যেই এদের রাখা হয়েছে।

ড্যান বেনেট হঠাৎ চমকে উঠল। লাউড স্পিকারের ভল্যুম বাড়ানো ছিল তাই আওয়াজটা জোরেই এসেছিল। হঠাৎ জোর আওয়াজ কানে ধাক্কা দেওয়ায় ড্যান বেনেট চমকে উঠেছিল। এই জোর আওয়াজ শুনে অন্য ঘর থেকে কর্মীরা ড্যানের ঘরে এসে জড়ো হয়েছিল।

কি বার্তা আসে শোনবার জন্যে তাদেরও আগ্রহ কম ছিল না।

ওদিক থেকে মাইকেল হারভে বলছে : এমজি (অর্থাৎ মাইকেল হারভে)

টু ডিবি (অর্থাৎ ড্যান বেনেট), এমজি টু ডিবি, তোমরা শুনতে পাচ্ছ।

ড্যান বেনেট বললো, এমজি বল, আমি ডিবি শুনছি ও আমাদের সব কথাবার্তা টেপ করে নিচ্ছি।

মাইকেল হারভে বললো : স্যাটেলাইট ঠিক ফল পয়েন্টে ল্যাণ্ড করেছে, আমরা এখন মেলোটাউনে ঢুকছি, স্যাটেলাইটটা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুলে নোব।

ভেরি গুড, এমজি, তোমার ট্রান্সমিটার খুলে রাখ।

মাইকেল হারভে বললো, ওভার। অর্থাৎ আপাততঃ বার্তা বন্ধ, সময় মতো আবার তোমাকে ডাকব। আমরা এখন ফল পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি।

ড্যান বেনেট সেই প্রবন্ধটা আবার পড়বার চেষ্টা করলো কিন্তু মাইকেল হারভের মোটর ভ্যানে ট্রান্সমিটার চালু আছে তাই একটু পরেই তার কথা মিশন কণ্ট্রোলের লাউড স্পিকার মারফত শোনা যাচ্ছে।

মাইকেল হারভে যেন ধারা বিবরণী দিচ্ছে : "আমরা এখন মেলোটাউনের ভেতরে। সবেমাত্র পেট্রল ফিলিং স্টেশন আর মোটেল পার হয়ে এলুম। চারদিকে সব শান্ত। কোথাও জীবনের সাড়া নেই। আমরা যেন একটা মৃত শহরে প্রবেশ করছি। যত এগিয়ে যাচ্ছি স্যাটেলাইটের বিপ্ বিপ্ আওয়াজ তত জোর হচ্ছে। একটা ছোট গির্জা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোনো দিক থেকে আর কোনো শব্দ এমন কি কুকুরের ডাকও শুনতে পাচ্ছি না।"

ড্যান বেনেট পত্রিকাখানা নামিয়ে রাখলো। মাইকেল হারভের স্বর স্বাভাবিক নয়, সে যেন রীতিমতো বিস্মিত ও চিন্তিত। ড্যান জানে মাইকেল হারভে হালকা ধরনের মানুষ নয়, যে কাজের সে ভার নেয় তাতে সে রীতিমতো গুরুত্ব অর্পণ করে, পুরো দায়িত্ব নিয়েই কাজ করে।

মাইকেল হারভে ও টম পিয়ার্স এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ড্যান বেনেট এবং অন্যান্য কর্মীরা তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

হারভে : এত নিস্তব্ধ কেন ?

টম কিছুক্ষণ চুপচাপ : তাই ত ! যেন মরা শহর।

টম : দেখুন।

হারভে : কি ?

টম : দেখতে পাচ্ছেন ?

হারভে : কি দেখতে পাচ্ছি ?

টম : ঐ দেখুন রাস্তার ধারে, ফুটপাথে, একটা লাশ পড়ে রয়েছে নাকি ?

হারভে : স্বপ্ন দেখছ নাকি ?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মোটর ভ্যান বুঝি থামল।

ক্যাঁচ করে ব্রেক কসার শব্দ শোনা গেল।

হারভে : ঠিক বলেছ ত ! মাই গড।

টম : ঐ দেখুন আর একটা

হারভে : মরে গেছে মনে হচ্ছে

টম : নেমে গিয়ে দেখে…

হারভে : না। বসে থাক।

মাইকেল হারভে এবার ড্যান বেনেটকে ডাকল। কণ্ঠস্বর জোর ও স্বাভাবিক।

এমজি টু ডিবি।

মাইকেল তোমাদের কথা শুনেছি। কি হয়েছে ?

মাইকেল বললো, স্যার সাংঘাতিক ব্যাপার ! কিছু বুঝছি না, চারদিকে লাশ পড়ে রয়েছে।

তুমি ঠিক দেখেছ ?

কোনো সন্দেহ নেই, চারিদিকে ডেডবডি।

ড্যান বেনেট বললো, এমজি তুমি আপাততঃ ডেডবডি রাখ, ক্যাপসুলটা দেখ।

যে বারোজন লোক ডিউটিতে ছিল তারাও সব কিছু শুনছিল, এখন সকলে ড্যান বেনেটের ঘরে এসে জড়ো হ'ল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে বা ঘটছে।

ভ্যান আবার চলতে আরম্ভ করলো। ওদের কানে আওয়াজ আসছে।

ড্যান বেনেট টেবিল থেকে পা নামিয়ে নিয়ে লাল আলোর সুইচ টিপল। তার অর্থ যতক্ষণ লাল আলো জ্বলবে ততক্ষণ ঘর থেকে কেউ বেরোবে না।

ড্যান বেনেট টেলিফোনেব রিসিভার তুলে বললো, গেট মি মেজব ওয়ালেস, আর্জেন্ট মেজর ওয়ালেসকে এখনি দাও, জরুরী।

যত স্যাটেলাইট বা ক্যাপসুল আকাশে ছাড়া হয়েছে তাদের দায়িত্ব এ মাসের জন্যে মেজব ওয়ালেসেব ওপর। মেজর ওয়ালেস মিশন কণ্ট্রোলের চিফ ডিউটি অফিসার। প্রতি মাসে তার ডিউটি বদল করা হয়।

কনেকশনের জন্যে অপেক্ষা কবতে কবতে ড্যান বেনেট রিসিভারটা গলা আর ঘাড়ের মাঝে আটকে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ইতি-মধ্যে দেওয়ালে আটকানো লাউড স্পিকাবে সে হারভে আর টমের কথা শুনতে পাচ্ছে :

হারভে : টম মানুষগুলো কি সত্যিই মরে গেছে ?

টম : সন্দেহ কি ? ওবা মবেই গেছে।

হারভে : কিন্তু দেখ মনে হচ্ছে মানুষগুলো ওখানে ঘুমোচ্ছে, আশ্চর্য ব্যাপার ত ! দশ বাবোটা ডেডবডি দেখলুম বোধহয়।

টম : মনে হচ্ছে লোকগুলো কোনো কারণে ঘরে বাইরে কিছু দেখতে এসেই মরেছে ও পড়েছে।

হারভে : ফুটপাথেও পড়েছে, রাস্তাতেও পড়েছে।

টম : চুপ, দেখুন লম্বা সাদা কোট গায়ে কে একটা লোক এদিকে আসছে···

হারভে : দেখেছি, আমাদেব দিকেই আসছে।

টম : স্যার এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়াই ভাল।

ড্যান বেনেট এই পর্যন্ত শুনলো তাবপরই আর্তকণ্ঠে একটা চিৎকার। লাউড স্পিকার স্তব্ধ হয়ে গেল। ড্যান বেনেট অনেক চেষ্টা করে ওদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারল না।

বিজ্ঞানজগতে এমন একটা দীর্ঘ সময় গেছে যখন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির আবিষ্কার নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বিষয়ে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নি যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল যেমন হয়েছিল অ্যাটম বোমা ফাটার পর বা মানুষ চাঁদে নামার পর। অবশ্য জেনেটিক কোড, 'ডি এন এ' 'আর এন এ' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু অ্যাটম বোমা বা মুন ল্যাণ্ডিং-এর তুলনায় কিছু নয়।

জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কৃতী সার্জন বা বিজ্ঞানীরা হার্ট কিডনি বদল করেছে, কৃত্রিম প্রজনন, বার্থ কন্ট্রোল পিল ইত্যাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছে কিন্তু অ্যাটম বোমা ও চাঁদে অবতরণ সব-শ্রেণীর মানুষকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে এমন আর কিছু পারে নি।

ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশে ব্যাপক আকারে মহামারীও দেখা দিয়েছিল যাতে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছে কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ যে আশু মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে এমন কোনো ঘটনা কি ঘটেছে?

হ্যাঁ। মাত্র কয়েক বছর আগে মানুষ এমনই এক সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এবং তার জন্য দায়ী একটি জীবাণু। সেই জীবাণু কোন্ শ্রেণীর তাও চেনা যায় নি, সনাক্ত করা ত যায়ই নি শুধু একটা কোড-নেম দেওয়া হয়েছিল "ডেভিল ট্র্যাঙ্গল।"

মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক মহাসংকটে পড়েছিল। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে যে সংকট দেখা দেয় তা হঠাৎ এসেছে মনে হলেও তার সূত্রপাত কিন্তু অনেক সময় অনেক আগেই আরম্ভ হয়। আইনস্টাইন তাঁর থিওরি অফ রিলেটিভিটি ১৯০৫-১৫ সালের মধ্যে প্রকাশ করলেন। তখন কি পৃথিবী জানত যে এই আবিষ্কার পৃথিবীকে এক সংকটে ফেলে দেবে?

আইনস্টাইনের আবিষ্কার পারমাণবিক যুগের সূত্রপাত করল, তারপর একদিন অ্যাটম বোমা ফাটল, যুদ্ধও থামল, কিন্তু পৃথিবীকে এক সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে।

পৃথিবী একদিন মেতে উঠল মহাকাশে ভ্রমণ করতে হবে। জার্মান, রাশিয়ান ও অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীরা রকেট তৈরি করতে আরম্ভ করলো।

তখন উদ্দেশ্য ছিল সৎ। কিন্তু জার্মানদের মাথাতেই প্রথম ঢুকল যে শত্রুব দেশে রকেট নিক্ষেপ করে যুদ্ধ জয় করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জিততে না পারলেও ইংলণ্ডের দক্ষিণে অনেক বকেট নিক্ষেপ করেছিল। যুদ্ধ শেষ হল, অ্যামেরিকা ও বাশিয়া মেতে উঠল কত বকম রকেট তৈরি করতে, চীনও পেছিয়ে নেই। এইসব রকেট নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছে।

বকেটের আর এক দিক অন্য কাজে লাগানো হল। বকেটেব সাহায্যে অন্য গ্রহে পৌঁছতে হবে। বাশিয়া আকাশে পাঠাল স্পুটনিক, অ্যামেরিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে চাঁদে গিয়ে নামল।

বকেটেব মাথায় স্যাটেলাইট লাগিয়ে সেগুলি আকাশে নিক্ষেপ কবা শুরু হল। ভিন্ন গ্রহের ও মহাকাশেব নানা খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভ্যাণ্ডেনবার্গ মিশন কণ্ট্রোল ছোট একটা ক্যাপসুল আকাশে পাঠিয়েছিল কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ কবতে যাব মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে যদি কোনো জীবাণু থাকে তা সংগ্রহ করে আনা।

ক্যাপসুলটাব নাম দেওয়া হয়েছিল 'হাইড্রা'। সেই মেলোটাউনেব কাছে হাইড্রা আকাশ থেকে নামল কিন্তু সেই সঙ্গে সে যে সংকট সৃষ্টি কবলো তার মোকাবিলা করতে বিজ্ঞানীরা হিমসিম খেয়ে গেল।

বিজ্ঞানাবা একসময়ে এতই আতংকিত হয়ে পড়েছিল যে শীঘ্রই একটা মহামড়ক আবম্ভ হবে যার ফলে মানুষ বা কোনো জীবই আর বেঁচে থাকবে না।

মোটবভ্যানে মাইকেল হাবভে এবং টম পিয়ার্সের ধারা বিবরণী শুনতে শুনতে ড্যান বেনেট ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং সবশেষে সেই আর্তকণ্ঠে চিৎকাব ও ধারা বিবরণী বন্ধ হযে যাওয়ায় সে আর অপেক্ষা করতে বাজি নয়।

সে তার ওপরওয়ালা আর্থার ওয়ালেসকে টেলিফোন করে পরামর্শ করবে ভাবছিল কিন্তু সেই আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ও ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে যেতেই সে স্থির কবল আর্থার ওয়ালেসকে সে বলবে এখনি মিশন

কণ্ট্রোলে চলে এসে এই সমস্যার ভার নিতে।

ভ্যান জানে আর্থার ওয়ালেস তখন হয়ত ঘুমোচ্ছে, তার ওপর সে ব্লাড প্রেসারের রোগী তবুও তাকে মিশন কণ্ট্রোলে ডেকে আনা উচিত। কারণ সে নিজে কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্ততঃ ডিউটি অফিসার হিসেবে সে তার ডিউটি করবে তারপর ওয়ালেস যা ভাল বুঝবে করবে।

ড্যান বেনেটের টেলিফোন পেয়ে আর্থার ওয়ালেস বিরক্তই হয়েছিল। সবে সে ঘুমিয়েছিল। তারপর উঠে পোশাক বদলে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে যেতে হবে। বিরক্ত হবারই কথা তবুও যখন জরুরী ডাক তখন বিরক্ত হয়েও লাভ নেই। ড্যান বোধহয় সত্যিই কোনো বিপদে পড়েছে নইলে সে রাত্রে কখনও তাকে টেলিফোন করে না।

আর্থার ওয়ালেস যখন ড্যান বেনেটের সামনে এসে বসল তখনও তার জড়তা কাটে নি। ড্যান সঙ্গে সঙ্গে বেশ গরম ব্ল্যাক কফি আনিয়ে দিল।

এবার সে সজাগ হল। মেলোটাউনে ভ্যানে বসে মাইকেল হারভে আর টম পিয়ার্স টেলিফোনে ড্যানকে যেসব কথা বলেছিল এবং পরে তারা নিজেদের মধ্যে যেসব কথা বলেছিল তারই টেপরেকর্ড আর্থার ওয়ালেসকে শোনানো হল।

মুখে পাইপ গুঁজে কান খাড়া করে ওয়ালেস রি-প্লে শুনতে লাগল। একবার নয়, তিনবার শুনল।

আর্থার ওয়ালেস মোটাসোটা মানুষ তার ওপর হাই ব্লাড প্রেসার আছে। এই ব্লাড প্রেসারের জন্যে তার চাকরিতে প্রমোশন নেয় নি। তাকে রোগা হতে বলা হয়েছে কিন্তু চেষ্টা করেও সে ওজন কমাতে পারে নি। তাই সে মাঝে মাঝে ভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে ফার্মিং করবে। তাতে ঝামেলা কম।

ওয়ালেস একজন এঞ্জিনিয়ার। আগে সে ছিল ওহায়ো স্টেটে রাইট প্যাটারসন এয়ার ফিলডে। আকাশে যে সব স্পেস ক্র্যাফট পাঠানো হচ্ছে সেগুলি অবতরণ করানোর বিষয়ে সে নানারকম পরীক্ষা করত।

তারপর সে ছোট আকারের আকাশযান তৈরি করতে আরম্ভ করে। যেগুলিকে 'ক্যাপস্যুল' আখ্যা দেওয়া হ'ল। 'হাইড্রা' এরকম একটা ক্যাপস্যুল। হাইড্রা-এর কাঠামো তার তৈরি। সেটা সে এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে ওটা সহজে মাটিতে বা জলে ল্যাণ্ড করতে পারবে। তবে ওদের ভাষায় 'ল্যাণ্ড' করা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে 'টাচ ডাউন'।

ওয়ালেস তিন ধরনের ক্যাপস্যুল তৈরি করেছিল এবং এ জন্যেই তাকে প্রমোশন দিয়ে ভ্যাণ্ডেনবার্গে পাঠান হয়েছে। এখানে এসে সে নিজের ডিজাইন অনুযায়ী একটা পোর্টেবল কমপিউটার তৈরি করল। নিজের কাজের সুবিধের জন্যে অবশ্য। এই কমপিউটারের নানা রকম শব্দ এমন কি প্রায় অশ্রুত শব্দেরও বিশ্লেষণ করা যায়।

কমপিউটারটা ওয়ালেস নিজে হাতে তৈরি করেছিল। কর্তারা অবাক। তারা অবিলম্বে তাকে হিউস্টনে স্পেস রিসার্চ স্টেশনে পাঠাতে চেয়েছিল কিন্তু ওয়ালেস সেখানে যেতে চায় নি। ভ্যাণ্ডেনবার্গে সে আরামেই আছে।

এমন যে তুখোড় লোক আর্থার ওয়ালেস সেও টেপ শুনে মাথামুণ্ডু কিছু ধরতে পারল না মেলোটাউনে কি ঘটেছে।

ড্যান বেনেট বলল, হারভে ও টমের কথা বন্ধ হয়ে গেলেও ট্রান্সমিশন বন্ধ হয় নি। ভ্যানের এঞ্জিন চালু ছিল, সে শব্দ আমরা পেয়েছি। তাব রি-প্লে আপনাকে শোনানোও হ'ল। আমিও কিছু বুঝতে না পেরে আপনাকে ডেকেছি।

ওয়ালেস একটু বিরক্ত হয়ে বলল, বৃথা সময় নষ্ট করেছ, আমাকে ডাক-বার আগে তোমার উচিত ছিল মেলোটাউনের ওপরে একটা স্ক্যাভেঞ্জার প্লেন পাঠান, ইনফ্রারেড ফটো তোলার জন্যে। অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। টেলিফোন দাও, আমি এখনি প্লেন পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আসলে স্ক্যাভেঞ্জার হল স্পাই প্লেন, গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে এই প্লেন ব্যবহার করা হয়। এই প্লেনে এমন ক্যামেরা লাগানো আছে যার দ্বারা রাত্রিব অন্ধকারেও একটা শহরের ছক ধরা যায়। এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র বসানো আছে যে তিরিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও নিচের শব্দ ধরা যায়।

তবে এখন ত ওরা গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাচ্ছে না তাই ওবা যতদূর সম্ভব নিচে দিয়ে মেলোটাউনের ওপর দিয়ে উড়বে এবং বিমান থেকে শহবে এমন এক ধরনের বোমা মাঝে মাঝে ফেলবে যা ফেটে চারদিকে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন ভাল ফটো তোলা যাবে।

মেলোটাউনের ওপর যথাসম্ভব নিচে নেমে এসে ওরা প্লেনে ফিট করা মুভি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে লাগল। ওরা খালি চোখেই দেখেছিল অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে।

তবে যেহেতু ওদের প্রতি নির্দেশ থাকে যে তোমরা শুধু ছবি তুলে যাবে, সিনারি দেখবে না, তাহলেই বিপদে পড়বে এবং অনেকে বিপদে পড়েছেও। এইজন্যেই ওরা মৃতদেহ গুণে দেখে নি।

দরজাটার ওপর লেখা আছে ডেটা প্রসেক্স এপসিলন। তার নিচে লাল অক্ষরে লেখা আছে অ্যাডমিশন বাই ক্লিয়াবেন্স কার্ড ওনলি। অর্থাৎ এই ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

এই ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ কেন তা ঘরেব ভেতর প্রবেশ করে বোঝা যায় না। কারণ এটি একটি মিনিয়েচার সিনেমা হল। বসবার আরামদায়ক চেয়ার আছে, দেওয়ালে সাদা স্ক্রীন আছে। দেওয়ালের ধারে কয়েকটা আলমাবি আছে।

প্রথমে ঘরে ঢুকল ড্যান বেনেট এবং আর্থার ওয়ালেস। তারপর ঢুকল একটি প্লেনের পাইলট এবং প্লেনের ফটোগ্রাফার। দরজা বন্ধ করে বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। যার অর্থ অনুমতি থাকলেও কেউ ঘরে এখন প্রবেশ করবে না।

প্রথম বিবৃতি দিল পাইলট। সে বলল, রাত্রি ১১টা ৮ মিনিট থেকে ১১ টা ১৪ মিনিট পর্যন্ত সে মেলোটাউনের ওপর উড়েছে। তার প্লেনের গতি ছিল ঘণ্টায় দুশো চৌদ্দ মাইল আর উচ্চতা আটশত ফুট।

এরপর ফটোগ্রাফার বলল, প্লেন ওড়ার সময় আমার ক্যামেরা চলছিল সেকেণ্ডে ছিয়ানব্বুই ফ্রেম হিসেবে। ছবি দেখানো আরম্ভ করি?

ওয়ালেস বলল, হ্যাঁ, আরম্ভ কর।

ফটোগ্রাফার প্রোজেকটর রেডি করে ঘর অন্ধকার করে পর্দায় ছবি ফেলতে আরম্ভ করল। পর্দায় ছবি পড়তেই সে বলতে লাগল :

ফটোগ্রাফার : এই ছবিটা আমাদের ফাইলে ছিল। পর্যবেক্ষণকারী একটা স্যাটেলাইট থেকে দু'মাস আগে ছবিটা তোলা। এটা হলো পিড-মণ্ট শহরের ছবি, জনসংখ্যা আটচল্লিশ। এই দেখুন জেনারেল স্টোর, পেট্রল পাম্প গায়ে গ্যাস লেখাটাও পড়া যাচ্ছে, পোস্ট অফিস, মোটেল বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর ঐ যে চার্চ।

আর্থার ওয়ালেস বলল, ঠিক আছে এবার তোমরা যে ছবি তুললে তা দেখাও।

ক্লিক। পর্দা অন্ধকার। আবার ছবি ফুটে উঠল। প্রায় কালো ছবি, তাহলেও বোঝা যায়। মাঝে মাঝে সাদা ছোপ তবে সব ছবিটায় একটা লালচে ছাপ যেন।

ফটোগ্রাফার বলছে : ইনফ্রারেড ফিল্‌মে তোলা ছবি। আপনারা ত জানেন এই ফিল্‌মে আলোয় ছবি তোলে না তোলে তাপ। যেগুলো গরম বা যে সব বস্তুতে তাপ আছে সেগুলো ছবিতে সাদা দেখা যাচ্ছে আর তাপহীনগুলো তাপের তারতম্য অনুসারে কালো।

এই দেখুন বাড়িগুলো রীতিমতো কালো কিন্তু মাটি অতটা কালো নয়, কারণ বাড়িগুলো এখন মাটি অপেক্ষা বেশি ঠাণ্ডা তাছাড়া রাত্রি হলেই বাড়ির তাপ জমি অপেক্ষা তাড়াতাড়ি কমতে থাকে।

ড্যান বেনেট জিজ্ঞাসা করল, ঐ সাদা ছাপগুলো কি ? চল্লিশ পঞ্চাশটা দেখা যাচ্ছে ?

ফটোগ্রাফার : ওগুলো ? ওগুলো সব ডেডবডি, শুনেছি, পঞ্চাশটা আছে। প্রায় সবাই চিৎ হয়ে পড়ে আছে, এইগুলো দেখুন, দু'টো হাত আর দু'টো পা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এই যে চৌকো মতো বস্তুটা দেখছেন ? এটা হ'ল একটা মোটরগাড়ি, একটা দিক বেশ সাদা, ওদিকে এঞ্জিন আছে, এঞ্জিনটা ছবি তোলার সময় চালু ছিল।

ড্যান বেনেট বলল, ওটা আমাদের ভ্যান, ওরই মধ্যে মাইকেল হারভে

আর টম পিয়ার্স ছিল।

ফটোগ্রাফার : এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবকটা মানুষই কি মরে গেছে ? আমি অবশ্য তা বলতে পারব না তবে লাশগুলোর তাপ কিছু বেশি ছিল, সাতচল্লিশটার সাদা ভাব কম, তার মানে এরা আগে মারা গেছে, তিনটের তাপ কিছু বেশি, ওগুলো বেশি সাদা। দু'টো ডেডবডি গাড়ির ভেতরে আছে।

ড্যান বেনেট বললো, ও দু'জন আমাদের লোক কিন্তু ঐ তিন নম্বরটা কে ?

ফটোগ্রাফার : সেটা তো আমাদেরও ধাঁধাঁ লাগছে। দেখবেন ছবি আরও যখন এগোবে লোকটার পজিশনের তত পরিবর্তন হবে। লোকটা রীতি-মতো সাদা তার মানে ওর শরীরে রীতিমতো তাপ আছে। আমাদের যন্ত্র অনুসারে ৯৫ ডিগ্রি, যদিও মানুষের স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা কম, সেটা হতে পারে, বাইরে যা ঠাণ্ডা ! আচ্ছা এবার দেখুন। লোকটা সরে গেছে। পরের ছবিগুলোতেও দেখা গেল লোকটা আবার স্থান পরিবর্তন করেছে, অন্ততঃ দশ গজ।

তাহলে একটা মানুষ কি বেঁচে আছে ? ড্যান প্রশ্ন করল।

আমাদের তো তাই মনে হয়, ফটোগ্রাফার বললো, লোকটা শুধু বেঁচে নেই, সে লাশগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও পর্যন্ত যদি সে বেঁচে থাকে।

ফটোগ্রাফার বললো যে বিমান থেকে ফসফরাস বোমা ফেলে মেলোটাউন আলোকিত ক'রে ওরা কিছু ছবি তুলেছে অপর প্লেন থেকে, সেগুলো এবার দেখানো হচ্ছে।

এই ছবিতে মৃতদেহগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। একজন যে ছবি তোলার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। বিমান দেখবার জন্যে সে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়েও ছিল।

কি দারুণ রহস্য ! ছোট্ট একটা কলোনির সব মানুষ মরে গেল আর একজন মাত্র বেঁচে রইল ?

এরপর স্বাভাবিক প্রশ্ন কে বা কিসে তাদের মারল ?

আর্থার ওয়ালেস তখনি পাইলট ও ফটোগ্রাফারদের বলে দিল তোমরা যা দেখলে বা শুনলে সে সমস্ত এই মুহূর্ত থেকেই 'টপ সিক্রেট' বলে বিবেচিত হবে। আমি এখনি ওয়াশিংটনকে বলব এমারজেন্সি ঘোষণা করতে এবং এই রহস্যময় মৃত্যু সম্বন্ধে অবিলম্বে তদন্ত করার ব্যবস্থা করব।

পাইলট ও ফটোগ্রাফারকে আর একবার সতর্ক করে দিয়ে ঘর থেকে চলে যেতে বললো তারপর ড্যান বেনেটকে বললো, আমি এখনি ওয়াশিংটন যাব, তুমি এয়ারফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্লেনের ব্যবস্থা কর। আমি বাড়িতে আছি। এই সব ছবি আমি সঙ্গে নিয়ে চললুম। স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে দেখাবো এবং পেন্টাগনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। মিলিটারির সাহায্যও প্রয়োজন হবে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা কতদূর সিরিয়স।

ড্যান বেনেট বললো, আমি প্লেনের জন্যে ব্যবস্থা করছি কিন্তু তুমি ওয়াশিংটন যাবার আগে ২২২ নম্বর ডিভিসনকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে গেলে ভাল হয় তাহলে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে এবং ওয়াশিংটন থেকে কল পেলেই যেন ওরা মেলোটাউনে গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারে।

বেশ তা করছি কিন্তু সবার আগে এখনি একটা কাজ করা অবশ্য দরকার যেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি, ওয়ালেস বলল।

কি ভুলে যাচ্ছি? ড্যান জিজ্ঞাসা করল।

মোলোটাউনের সিকিউরিটি গার্ডদের সতর্ক করে দাও যে তারা যেন শহরের অন্ততঃ দু'মাইলের ভেতর না যায় এবং কোনো গাড়ি বা মানুষকে মেলোটাউনে ঢুকতে দেওয়া না হয়, দরকার হলে প্রতিটি চেকপয়েন্টে লোক বাড়াতে বল।

ড্যান বেনেট আবার একটা প্রশ্ন করল তাহলে 'হাইড্রা' ক্যাপসুল এখন উঠিয়ে আনার কোন প্রশ্নই উঠছে না?

নিশ্চয়ই না। আমি এখন ২২২ নম্বর ডিভিসনকে টেলিফোন করবো তুমি এয়ারফোর্স স্টেশনে ফোন কর। ফোন করে এয়ারফোর্স স্টেশন পর্যন্ত আমি যাবার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখ।

আর্থার ওয়ালেস একটা সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এই ঘর থেকে সকল গোপনীয় ও জরুরী টেলিফোন করা হয়। এই ঘরের টেলিফোন লাইনের সঙ্গে এমন একটা যন্ত্র বসানো আছে যে কেউ যদি লাইনে আড়ি পেতে থাকে তা তৎক্ষণাৎ সেই যন্ত্রে ধরা পড়বে এবং আড়িপাতা ফোনের সঙ্গে লাইন বিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত লাইনে কথা বলা যাবে না।

২২২ নম্বর ডিভিসন মার্কিন সরকারের একটি বিশেষ ও বিরাট বিভাগ। সরকাবের বিভাগ বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমতি নিয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে তার উদ্দেশ্য ও সম্পর্ণ বিবরণী এই ২২২ নম্বর ডিভিসনকে জানিয়ে রাখলে পবে যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে তার সব ব্যবস্থা এই ডিভিসন করে দেবে।

বলা বাহুল্য হাইড্রা ক্যাপসুলের সমস্ত ব্যাপাবটাব খুঁটিনাটি "প্রজেক্ট হাইড্রা" শিবোনামে ২২২ নম্বর ডিভিসনকে জানানো আছে।

আর্থার ওয়ালেস সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে ঢুকে আগে টেলিফোন লাইন চেক করে নিল। ২২২ নম্বর ডিভিসনের টেলিফোন নম্বর প্রায়ই বদল করা হয়। নতুন নম্বর হলো ওয়ান জিরো টু জিরো নাইন। এই ডায়াল করে দু'সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হবে। আবার একটা ডায়ালটোন শোনা যাবে। তখন ঐ নম্বরটা উলটো দিক থেকে ডায়াল কবতে হবে যথা নাইন জিরো টু জিরো ওয়ান।

কিন্তু কেউ লাইন ধরবে না। ওপাবে অটোম্যাটিক যন্ত্র বসানো আছে। তারা এপারের কণ্ঠস্বর ও বক্তব্য রেকর্ড করে বাখবে।

নিয়মানুসারে আর্থার ওয়ালেস দু'বার ডায়াল করলো। তারপরও দু'-সেকেণ্ড কাটলো। ওধার থেকে পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, একটুও অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই। সেই স্বর বলছে :

তোমার বক্তব্য আমরা রেকর্ড করে রাখছি। তোমার নাম আর যা বলবার আছে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখ।

অতএব ওয়ালেস বললো আমার নাম আর্থার ওয়ালেস, ভ্যাণ্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স বেস, প্রজেক্ট হাইড্রা, কোড নম্বর পি এইচ ৫০৫ ভিএবি।

জরুরী, অবিলম্বে কাজে নামতে হবে। সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আছে।

বক্তব্য বলে ওয়ালেস রিসিভার নামিয়ে রেখে দশ মিনিট অপেক্ষা করলো। এদের নিয়ম হলো দশ মিনিটের মধ্যে না ডাকলে বারো ঘণ্টার মধ্যে আর কেউ ডাকবে না।

দশ মিনিট অপেক্ষা করে ওয়ালেস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ড্যান বেনেটকে ডাকলো। ড্যান ভালো খবরই দিল। আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটা মিলিটারি প্লেন ওয়াশিংটন যাবে। ওয়ালেস যেন বাড়িতে অপেক্ষা করে। মিলিটারি জিপ ওয়লেসকে বাড়ি থেকে তুলে নেবে।

ওয়ালেস আর অপেক্ষা না করে তখনি বাড়ি ফিবলো। যাবার সময় মেলোটাউনের ওপর তোলা ছবি এবং ভ্যানের মধ্যে বসে মাইকেল হারভে ও টম পিয়ার্স যেসব কথা বলেছিল তার টেপ রেকর্ডিং সঙ্গে নিল।

বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে না নিতেই মিলিটারি জিপ এসে গেল।

ওদিকে ২২২ নম্বর ডিভিসন আর্থার ওয়ালেস মারফত কোড নম্বর পি এইচ ৫০৫ ভিএবি-এর খবর পেয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে খবর পাঠিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছে, প্রস্তুত থাক, মেসেজ পেলেই কাজে নামতে হবে।

এছাড়া পাঁচজনের নামে এমারজেন্সি নোটিস পাঠানো হলো। ওরা হলেন ডঃ নরম্যান মারকাস, স্যাম চেসার, গ্যারি হাস্টন, ফিলিপ রোডস, বিল ইয়ং।

জ্যানেট মারকাস বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির ক্যাম্পাসের বিপরীত দিকে ওদের বাড়িতে একটা পার্টি চলছে। পার্টি দিচ্ছেন জ্যানেটের স্বামী স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকটিরিওলজি বিভাগের প্রধান ডঃ নরম্যান মারকাস ও জ্যানেট।

পার্টিতে পনেরোটি দম্পতি এসেছে। রাত্রি অনেকটা এগিয়ে গেছে কিন্তু একজনও ওঠবার নাম করছে না। এই পার্টির নিয়ম হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর দ্বিতীয়বার কফি না দিলে বুঝতে হবে পার্টি শেষ, এবার যে যার বাড়ি ফেরো। সেই নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার কফিও দেওয়া হল না তবুও কারও ওঠবার নাম নেই।

রাত্রি একটা বাজবার একটু আগে ডোরবেল বাজল। দরজা খুলে দিয়ে জ্যানেট ভয় পেয়ে গেল। দরজার বাইরে দু'জন মিলিটারি দাঁড়িয়ে। ওরা পাশাপাশি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং যেভাবে জ্যানেটের দিকে চাইলো তা দেখে জ্যানেট নারভাস হয়ে গেল বিশেষ করে এত রাত্রে।

জ্যানেট কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ওরা কেন এত রাত্রে ওদের বাড়িতে এলো? রাত্রে কি রাস্তা ভুল করেছে নাকি ওদের কোনো ইউনিটে টেলিফোন করতে চায়?

এইরকম কিছু একটা অনুমান করে জ্যানেট জিজ্ঞাসা করলো :

টেলিফোন করবেন কোথাও?

একজন উত্তর দিল, না টেলিফোন নয়, এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত কিন্তু ম্যাডাম এটা কি ডঃ নরম্যান মারকাসের বাড়ি?

হ্যাঁ, এখানেই তিনি থাকেন।

বাইরে জ্যানেট দেখতে পাচ্ছিল একখানা নীলরঙের মিলিটারি সিডান গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির কাছেই একজন অপেক্ষা করছে, তার হাতে একটা লাইট মেসিন গান বা অনুরূপ একটা অস্ত্র।

জ্যানেট সেই লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো :

ওর হাতে কি মেসিন গান?

লোকটি এ কথার উত্তর না দিয়ে বললো, ম্যাডাম আমরা এখনই ডঃ মারকাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জ্যানেট তো আগেই ভয় পেয়েছিল, নারভাসও হয়ে গিয়েছিল, এখন সে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, তার হাত পা যেন অসাড় হয়ে গেল। তবুও সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো : ব্যাপারটা কি?

ম্যাডাম আপনার বাড়িতে একটা পার্টি চলছে, আমরা সেজন্যে গোলমাল করতে চাই না। আপনি অনুগ্রহ করে ডঃ মারকাসকে ডেকে দিন

কি জন্যে ডাকব বলুন ? জ্যানেটের বুঝি একটু সাহস হলো।

আপনি যদি ডেকে না দেন তাহলে আমাদেরই ভেতরে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে হবে।

জ্যানেট একটু ইতস্ততঃ করলো তারপর বললো, তাহলে আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন।

সে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলো কিন্তু ততক্ষণে একজন ভেতরে প্রায় ঢুকে পড়েছে অতএব জ্যানেট দরজা বন্ধ করতে পারলো না। লোকটি ভেতরে ঢুকে মাথার টুপি খুলে টুপিটা হাতে নিয়ে বেশ ভদ্রভাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে বললো .

ম্যাডাম আমি এখানে অপেক্ষা করব, বলে একটু হাসল।

পার্টি যেখানে চলছিল সেখানে গেল এবং এমন ভাব দেখালো যেন কিছুই হয় নি। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি, সকলেই গল্প করছে, হাসছে, তখনও পার্টি বেশ জমজমাট।

ডঃ মারকাস তখন কোনো একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে তর্ক করছিলেন। জ্যানেট কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিতেই ডঃ মারকাস মাপ চেয়ে উঠে এলেন।

একটু তফাতে আসতেই জ্যানেট তাকে বললো, দেখ আমার কি রকম মনে হচ্ছে, মিলিটারি তোমাকে ডাকতে এসেছে কেন ? বাইরে গাড়ি নিয়ে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে মেসিন গান। তারা তোমাকে এখনি ডাকছে।

ডঃ মারকাস যেন অবাক হলো কিন্তু সে ভাব তখনি কাটিয়ে বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

জ্যানেট বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। চারজন মিলিটারিম্যান গাড়ি নিয়ে এসেছে সঙ্গে আবার মেসিনগান। জ্যানেটের কি রকম সন্দেহ হলো, তার স্বামী কি রাশিয়ার গুপ্তচর নাকি ? সে জিজ্ঞাসা করলো :

নরম্যান তুমি যেন আশা করছিলে ওরা আসবে ? কি হয়েছে আমাকে

বলবে না ?

জানি না ওরা কি বলবে, আমি তোমাকে পরে বলবো।

সেই মিলিটারি টুপি হাতে যেখানে অপেক্ষা করছিল ডঃ মারকাস তার কাছে গিয়ে বললেন, আমিই ডঃ নরম্যান মারকাস।

আমি ক্যাপটেন বেয়ার্ড, এমারজেন্সি কল এসেছে স্যার।

ঠিক আছে কিন্তু আমি আমার ডিনার জ্যাকেটটা পালটে আসি।

আমি দুঃখিত স্যার, অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।

জ্যানেটও স্বামীকে অনুসরণ করে এসেছিল। সে অবাক হলো যে তার স্বামী তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। একটুও আপত্তি করলো না। পার্টি ড্রেস পরেই যেতে রাজি হয়ে গেল বললো 'অলরাইট'।

ডঃ মারকাস স্ত্রীকে বললেন, আমাকে এখনি যেতে হবে।

জ্যানেট লক্ষ্য করলো স্বামীর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। এমন ঘটনা যেন রোজই ঘটে। জ্যানেট কিছু বুঝতে পারছে না। সে জিজ্ঞাসা করলো, কখন ফিরবে ?

ঠিক বলতে পারছি না ; দু'এক সপ্তাহ কিংবা দেরিও হতে পারে।

কি বলছ নরম্যান আমি কিছু বুঝতে পারছি না, এরা কি তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে ?

ডঃ মারকাস একটু হেসে বললো, আরে না, সেরকম কিছু নয়, আমার হয়ে তুমি পার্টিতে সকলের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ো, বুঝলে ?

ওদের সঙ্গে মেসিনগান কেন ?

সেই মিলিটারিম্যান এবার বললো, মিসেস মারকাস আমাদের কাজ হলো আপনার স্বামীর এখন থেকে যেন কোনো ক্ষতি না হয় তা দেখা।

ডঃ মারকাস বললেন, বুঝতে পারছ না আমি হঠাৎ একজন ভিআইপি হয়ে গেছি। ডঃ মারকাস এই কথা বলে ভুরু নাচিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে একটু হাসলেন। তিনি আর কিছু না বলে সেই মিলিটারিম্যানকে অনুসরণ করে চললেন। গাড়ির পাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে ডঃ মারকাসকে স্যালুট করে দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে দরজা ধরে

দাঁড়ালো। ডঃ মারকাস গাড়িতে ওঠবার আগে একজন মিলিটারি ম্যান ওধারের দরজা দিয়ে উঠে পড়েছিল, ডঃ মারকাস গাড়িতে ওঠার সঙ্গে আর একজন গাড়িতে উঠে তাঁর পাশে বসলো। বাকি দু'জন সামনের সিটে বসলো।

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হলো, হেডলাইট জ্বললো। গাড়ি কিছু দূর ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। জ্যানেট দেখলো গাড়িব ব্যাকলাইট ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

জ্যানেট তখনও দাঁড়িয়ে। পার্টি থেকে একজন উঠে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো: কি মিসেস মাবকাস আপনার শরীর ভাল আছে তো?

না, ঠিক আছে, নবম্যানকে হঠাৎ ডেকে নিয়ে গেল তো? ল্যাববেটবিতে কি বুঝি গোলমাল ঘটেছে।

তাই বলে এত রাত্রে? বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কি এমন এমার-জেন্সি ঘটতে পারে?

এরপর অবশ্য পার্টির চেহারা দ্রুত বদলে গেল এবং অতিথিবা একে একে বিদায় নিতে লাগলো।

গাড়িতে ডঃ মারকাস লোকগুলির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, সকলে যেন স্ট্যাচু। তবুও তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাব জন্যে কোনো মেসেজ আছে?

কি বললেন?

আমাকে কি কিছু পাঠিয়েছে? নিশ্চয় কিছু পাঠিয়েছে।

ও হ্যাঁ স্যাব এই যে এই ফাইলটা।

ব্রাউন রঙের একটা সীলকরা ফাইল। ওপরে লেখা টপ সিক্রেট, তার নিচে প্রজেক্ট হাইড্রা : ক্যাপস্যুল। তার নিচে কোড নম্বব পিএইচ ৫০৫ ভিএবি। লোকটি এই ফাইলটি ডঃ মারকাসের হাতে দিল।

ডঃ মারকাস জিজ্ঞাসা করলেন, আর কিছু দেয় নি?

না স্যার।

ডঃ মারকাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। প্রজেক্ট হাইড্রা সম্বন্ধে তিনি আগে কিছু শোনেন নি। ফাইলটা ভাল করে পড়তে হবে কিন্তু গাড়িতে বসে পড়া যাবে না, আলো কম। প্লেনে উঠে পড়া যাবে এখন।

কি জানি কেন ডঃ মারকাসের তখন অন্য একটা সেমিনারের কথা মনে পড়লো। ফিলাডেলফিয়াতে জীবাণুবিদদের একটা সেমিনার হয়েছিল। রাশিয়ার সঙ্গে যদি আর একটা যুদ্ধ বাধে তাহলে তারা কি জীবাণু যুদ্ধের আশ্রয় নেবে? কি জীবাণু তারা প্রয়োগ করতে পারে? অ্যামেরিকা কি ভাবে তার মোকাবিলা করবে?

সেই সেমিনারে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীও ছিলেন, তিনি একটা প্রশ্ন তুললেন, যুদ্ধের সময় কেন? এখনই তো পৃথিবীর কয়েকটি দেশ উন্নতি-কামী দেশগুলিতে মারাত্মক রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে যেমন ভারতে ব্যাপকহারে এনকেফালাইটিস রোগ দেখা দিচ্ছে, ভিয়েতনামে আমাশয়ে হাজার হাজার নরনারী প্রাণ দিয়েছে, জিম্বাবোয়েতে ইনফ্লুয়েঞ্জা, লেবাননে কলেরা। আজকাল তো দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই একটা জাতিকে দুর্বল করে দেওয়া যায়। শুধু জীবাণু ছড়িয়ে কেন আরও নানা ভাবে ক্ষতি করা যায়। বিমান থেকে কোনো রসায়ন বা পোকা ছেড়ে দিয়ে ধান গম চা পাট ইত্যাদির ক্ষেতে মড়ক লাগিয়ে দেওয়া যায়। এসব আপনারা আগে বন্ধ করুন তারপর যুদ্ধের কথা ভাববেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীর বক্তব্য সমর্থন করে শ্রীলংকার একজন বিজ্ঞানী বললেন, আপনারা যুদ্ধকালীন বিপদের কথা ভাবছেন ভাল কথা, আমার ভারতীয় বন্ধু শান্তিকালীন যে বিপদের কথা বললেন আমি তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে আর একটা বিপদের কথা বলতে চাই। সেটা সারা পৃথিবীরই বিপদ এবং সে বিপদ ডেকে আনছে অ্যামেরিকা ও রাশিয়া।

সভায় একটু সোরগোল উঠলো।

শ্রীলংকার বিজ্ঞানী বললেন আপনারা মহাকাশে রকেট পাঠাচ্ছেন। সেই রকেটে চেপে মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, তারা মহাশূন্যে বিচরণও

করছে। তারা ফিরে এলে তাদের কয়েকদিন কোয়াবানটাইনে আবদ্ধ করে রেখে ছেড়ে দিচ্ছেন কিন্তু তারা যে আমাদের অচেনা এমন কোনো মারাত্মক রোগজীবাণু বহন করে আনছে না যাকে আমরা ধ্বংস করতে পারি সে বিষয়ে আপনারা কেউ কিছু কি বলতে পারেন ?

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু সেই সেমিনারে এইসব প্রশ্নের কেউ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নি।

ডঃ নরম্যান মারকাস সেই সেমিনারে উপস্থিত থাকলেও তিনি কিছু বলেন নি। তবে প্রশ্নগুলি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল বিশেষ করে মহাকাশের জীবাণু বা ভাইরাস। তারা যদি পৃথিবীতে আসে তাহলে তারা পৃথিবীর ভালো করবে না ক্ষতি করবে ?

অথচ ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক ডঃ নরম্যান মারকাস সেই সিমপোসিয়মে উপস্থিত শীর্ষস্থানীয় জীবাণুবিদদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি তখনই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকটিরিওলজি বিভাগের প্রফেসর এবং সবে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে নরম্যান মারকাস ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। নানা ধাপে তিনি নানা সফল ও সার্থক আবিষ্কার করেন বিশেষ করে ভাইরাস সম্বন্ধে তাঁর একটি আবিষ্কার নতুন দিক উন্মোচন করেছে আর সেই জন্যেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

তাঁর এক বন্ধু বিজ্ঞানী বলেছেন যে কোয়াণ্টাম ও অ্যাটমিক সায়েন্সও নরম্যানের প্রগাঢ় জ্ঞান। নরম্যান ইচ্ছে করলে এসব বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেতে পারে।

ডঃ নরম্যান মারকাসের প্রতিভা ও সখ বহুমুখী। তিনি সুলেখক, বাড়িতে জাপানী বনসাই প্রথায় অনেক ফল ও ফুলের গাছ তৈরি করেছেন, কফির সঙ্গে কি মিশিয়ে নতুন এক পানীয় তৈরি করেছেন, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন।

দোহারা চেহারা, খাড়া নাক, উজ্জ্বল চোখ, সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুরসিক ও কঠোর পরিশ্রমী। আবার ছবিও আঁকতে পারেন।

বলাবাহুল্য যে এমন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যে দূর দৃষ্টিসম্পন্ন হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! শ্রীলংকার সেই বিজ্ঞানীর আশংকা তাঁর মাথায় ঢুকে গেল এবং তিনি সেই দিন থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। শ্রীলংকার বিজ্ঞানী ঠিকই বলেছেন, এ নিয়ে এখনি কাজ আরম্ভ করা উচিত।

পরদিনই তিনি শ্রীলংকার সেই বিজ্ঞানীকে তাঁর চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করে একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে উল্লেখ করলেন যে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করবেন।

একদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রসায়ন ও ভৌতবিজ্ঞানীর অভাব ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ মৌলিক গবেষণা এ দেশেই সম্পাদিত হয়েছিল। নাৎসী জার্মানি থেকে বিতাড়িত ইহুদি বিজ্ঞানীদের আশ্রয় দিয়ে ও তাদের মার্কিন নাগরিকত্ব দিয়ে মার্কিন দেশ বিজ্ঞানে এই অগ্রগতি সম্ভব করেছিল। এই সব বিজ্ঞানীদের সাহায্যে মার্কিনরা বিজ্ঞানের অন্য দিক যথা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীবাণু বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

ইতিমধ্যে ডঃ নরম্যান মারকাস প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং প্রথম সারির একজন সেনেটরের কন্যাকে বিবাহ করে রাজনীতিক মহলেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। কয়েকটি উপদেষ্টা কমিটিতে মার্কিন সরকার তাঁকে সদস্য নির্বাচিতও করেছেন।

শ্রীলংকার সেই বিজ্ঞানী ডঃ গুণশেখরণের চিন্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে ডঃ মারকাস "স্টেরিলাইজেশন অফ স্পেসক্র্যাফট" অর্থাৎ মহাকাশযান বিশোধন সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটি অ্যামেরিকার গুরুত্বপূর্ণ 'সায়েন্স' পত্রিকায় ছাপা হলো এবং সেটি ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকাতে পুনর্মুদ্রিত হলো।

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানী মহলকে ভাবিয়ে তুললো। অ্যামেরিকার ন্যাশানাল এরোনটিকস অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেসব অনুসন্ধানী রকেট অন্য গ্রহে পাঠাতো সেগুলি পৃথিবীতে ফিরে আসার পর সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করত কারণ তাদের আশংকা ছিল

যে মার্স বা ভেনাসে প্রেরিত অনুসন্ধানী রকেটে যদি পৃথিবীর কোনো জীবাণু থাকে তাহলে সেই জীবাণুর সংস্পর্শে ভিন গ্রহের জীবাণু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়ার ফলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

কিন্তু অনুসন্ধানী স্যাটেলাইট বা ক্যাপসুল পৃথিবীতে ফিরে আসবার পার অন্য গ্রহ, উপগ্রহ বা মহাকাশ থেকে জীবাণু এনে বিপর্যয় ঘটাতে পারে সে চিন্তা বোধহয় তাবা কবেন নি।

আশ্চর্যেব বিষয় বিবাট দেশ অ্যামেরিকা, বিরাট বিবাট তাদেব ল্যাববে-টবি, পৃথিবীর সেবা মাথাগুলোকে যারা জড়ো কবেছে তাদের মাথায় বিপদের এই সম্ভাবনাটা ঢোকে নি।

ঢুকলো কার মাথায়? ছোট্ট এক দেশের বিজ্ঞানীর মাথায় যে দেশের বিজ্ঞানে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই এবং যে বিজ্ঞানী জাতীয় পুরস্কার ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান নি বা দেওয়া হয় নি।

বিজ্ঞানীমহল ডঃ মারকাসের প্রবন্ধ পড়ে ভাবতে শুরু করলেন কি করা যেতে পাবে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা হলো, খবরের কাগজে কয়েকখানা চিঠিও ছাপা হলো।

তবে আসল কাজ শুরু করলো ডঃ মারকাস স্বয়ং। স্ট্যানফোর্ড মেডিক্যাল ইসকুলের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সাতাশ নম্বর ঘরে তিনি চারজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

এই চারজন হলো স্ট্যানফোর্ডের ফিজরয় শেপার্ড, ক্যালিফরনিয়া মেডি-ক্যাল ইনস্টিটিউটের ফিজরয় ম্যাকলিন এবং হিলারি সণ্ডার্স আর বার্কলে বায়োফিজিক্স বিভাগের জর্জ ওয়েস্ট।

এরা সকলেই সর্বজনমান্য এবং নিজ নিজ বিষয়ে কৃতী বিজ্ঞানী। সত্যই যদি পৃথিবীতে মহাকাশ থেকে কোনো মারাত্মক জীবাণু যেভাবে হোক পৃথিবীতে এসে পড়ে তাহলে কি করে তার মোকাবিলা করা যাবে এ জন্যে তারা একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তার নাম দিল "প্রজেক্ট টাচফেদার।"

পরিকল্পনা তো প্রস্তুত হলো কিন্তু তা এত ব্যাপক যে সরকারী সাহায্য

ছাড়া তার রূপ দেওয়া অসম্ভব। শুধু যে কয়েক কোটি ডলার ব্যয় হবে তা তো নয়, কিছু আইনকানুন প্রণয়ন করতে হবে, আরোপ করতে হবে কিছু বিধিনিষেধ।

অতএব তারা সাব্যস্ত করল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানি যে অ্যাটম বোমা তৈরি করতে পারে তা জানিয়ে আইনস্টাইন তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডেলানো রুজভেল্টকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন যার ফলে অ্যামেরিকা নিজে অ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট' গঠন করেছিল। তারাও তেমনি পৃথিবীও যে একদিন অপার্থিব জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে ফলে মহামড়ক আরম্ভ হতে পারে এবং তাই যদি হয় তাহলে কি করে তার মোকাবিলা করা হবে তা জানিয়ে প্রেসিডেন্টকে একখানা চিঠি দেওয়া সাব্যস্ত করা হলো। সেই সঙ্গে 'প্রজেক্ট টাচফেদার'-এর পুরো প্রস্তাব এবং সম্ভাব্য ব্যয় জানিয়ে দেওয়া হোক।

এরা সকলেই যশস্বী বিজ্ঞানী। কাজে কোনো খুঁত রাখতে চান না। প্রজেক্ট টাচফেদার-এর সমস্ত খুঁটিনাটি এবং তার প্রতি ধাপের ও পরিচালনা বাবদ কি পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসরে প্রয়োজন হবে তাও বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিলেন।

বিজ্ঞানীরা আরও প্রস্তাব করলেন যে সরকার যদি তাঁদের এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করে দেন তাহলে সেটি দেশের কোনো নির্জন অঞ্চলে এবং মাটির নিচে স্থাপন করা হোক।

আইনস্টাইন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার উত্তরে রুজভেল্ট কিন্তু গোড়ার দিকে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। যেটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাও তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছিল।

আইনস্টাইন তো প্রথমে চিঠি লিখতেই চান নি। তিনি বলেছিলেন আমি সামান্য একজন মানুষ, আর প্রেসিডেন্ট একজন অতি ব্যস্ত মানুষ, আমার চিঠি কি তিনি পড়বেন? নাকি কোনো গুরুত্ব দেবেন?

কিন্তু জিলার্ড নামে একজন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে দিয়ে এই চিঠি লিখিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট যাতে এই চিঠি পড়েন তার ব্যবস্থাও

করেছিলেন। স্যাখট নামে একজন অর্থনীতিবিদ প্রেসিডেন্টের বেসরকারী উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি প্রায়ই রুজভেল্টের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতেন। সেই স্যাখট্ আইনস্টাইন প্রেরিত চিঠি রুজভেল্টকে পড়তে বলেন এবং যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতেও বলেন।

এরপর যুগ পালটে গেছে। রাজনীতিকরা অনেক বিষয়ে ঠেকে শিখে বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। তাই ডঃ নরম্যান মারকাস প্রমুখ পাঁচজন বিজ্ঞানী প্রেরিত চিঠি পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের কাছ থেকে তাঁর ডাক পড়লো। ডঃ মারকাস পরদিনই ওয়াশিংটনে উড়ে গেলেন। উপদেষ্টাগণ, ন্যাশানাল সিকিউরিটি কাউনসিলের সদস্যগণ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতে হলো এবং শেষে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে আলোচনা সেরে তিনি আরও কিছু আলোচনার জন্যে উড়ে গেলেন হিউস্টনে ন্যাশানাল এরোনটিকস এবং স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে।

কিছু বাধাবিপত্তি তো উঠবেই, তথাপি অধিকাংশ বিজ্ঞানী উপদেষ্টা ও সরকার 'প্রজেক্ট টাচফেদার'-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন। এক মাসের মধ্যে ডঃ মারকাসকে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে 'প্রজেক্ট টাচফেদার' তিনি নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেন। এর রূপায়ণের ভার তিনি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে দিলেন। সেই ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট 'প্রজেক্ট টাচফেচারের' রূপ দেবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। যথাসময়ে উক্ত অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট বা এআরপি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

এআরপি গ্রুপের হাতে তখন অনেক কাজ থাকলেও এই নতুন কাজটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো, যাকে বলে 'টপ প্রায়োরিটি'। কাজের ভার যাদের হাতে দেওয়া হলো তারা সকলেই অত্যন্ত সুদক্ষ ব্যক্তি এবং যারা এই কাজে নিযুক্ত তারা কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলেই সরকারী মহলে সুপরিচিত। এখানে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন। পরীক্ষার অনেক ধাপ পার হতে হয়। অ্যামেরিকায় ইতিমধ্যে একটা লুনার রিসিভিং ল্যাবরেটরি ছিল।

অ্যাপলো স্পেসক্র্যাফটে চেপে যারা চাঁদে গিয়ে ফিরে এসেছে তাদের এই ল্যাবরেটরিতে তিন সপ্তাহ আটকে রাখা হতো। উদ্দেশ্য, তাদের দেহে যদি চাঁদের কোনো ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস আটকে গিয়ে থাকে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়া।

সেইজন্য ডঃ মারকাস যখন তাঁর 'প্রজেক্ট ফেদারটাচ' পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন তখন একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের তো একটা লুনার রিসিভিং ল্যাবরেটরি রয়েছে, সেটাকে একটু বড় করে নিলেই তো হয়, নতুন ল্যাবরেটরির দরকার কি? দরকার যে আছে সেটা বোঝাতে ডঃ মারকাসকে অনেক অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

যাই হোক এব্যাপারে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রথম দফাতেই বাইশ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করা হলো। নেভাডা স্টেটের নির্জন ফ্ল্যাটরক অঞ্চলে স্থান নির্বাচিত হলো। মাটির অনেক নিচে বাড়ি তৈরি আরম্ভ হলো। সে অনেক জটিল ব্যাপার। মাটির নিচে বহুতল বাড়ি, সেই বাড়িতে কর্মীদের হয়তো একাদি ক্রমে মাসের পর মাস থাকতে হবে, তাদের কর্মঠ রাখতে হবে, স্বাস্থ্যহানি হলে চলবে না।

শেষ পর্যন্ত পাঁচতলা বাড়িটি তৈরি শেষ হলো। প্রথমে বাসোপযোগী সকল ব্যবস্থার কাজ শেষ হলো তারপর ল্যাবরেটরিগুলি একে একে তৈরি হলো। সবই অত্যন্ত গোপনে। তবুও কিছু খবর ফাঁস হয়েছিল। বিদেশী গুপ্তচররা সন্দেহ করেছিল অ্যামেরিকা কোনো নতুন অস্ত্র তৈরির মতলবে আছে।

ল্যাবরেটরি সজ্জিত করার ভার ডঃ মারকাস এবং তাঁর চারজন সহযোগী যাঁরা প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছিলেন তাঁরাই সেই ভার নিয়েছিলেন। ল্যাবরেটরিগুলি যথাযথভাবে সজ্জিত হবার পর বেছে বেছে লোক নেওয়া হলো।

এই বিরাট কাজ দু'বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হলো।

আমাদের আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে।

নীল সিডান গাড়িতে ডঃ মারকাসকে উঠিয়ে এবং তাঁর হাতে ফাইল

ধরিয়ে দিয়ে মিলিটারিম্যান বললো, স্যার এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আমরা আর কোনো ব্যবস্থা করতে পারি নি। আপনি আমাদের কাজে নিশ্চয় সন্তুষ্ট হয়েছেন।

গাড়িএসে এয়ারপোর্টে পৌঁছলো। তাঁকে একটা বোইং সেভেন টু সেভেন জেট প্লেনে তোলা হলো। প্লেনে একটিও প্যাসেঞ্জার নেই ; সম্পূর্ণ খালি। স্যার আপনি ফার্স্ট ক্লাসেই বসুন, মিলিটারিম্যান বললো।

তাতে কিছু যায় আসে না, বলে ডঃ মারকাস একটা সিটে বসলেন।

মিলিটারিম্যান চলে গেল পরিবর্তে কোনো এয়ার হোস্টেস এল না। এল কোমরে পিস্তল গুঁজে একজন মিলিটারি পুলিশ। এঞ্জিন সরব হলো, প্লেন আকাশে উঠলো। ডঃ মারকাস সেই ফাইলটিতে মন দিলেন, তিনি প্রতিটি শব্দ পড়তে লাগলেন।

হাইড্রা নামে যে স্যাটলাইট বা ওদের ভাষায় ক্যাপসুল বা স্কুপ বলা হয় তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই পরীক্ষা চলছে। মেলোটাউনে নেমেছে আরও আগে আরও ছটা ক্যাপসুল যেগুলি মহাকাশে পাঠানে হয়েছিল।

অ্যামেরিকায় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের বিরাট একটা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিসন আছে। সেই ডিভিসনের কয়েকটা পৃথক বিভাগ আছে যার মধ্যে আর্মি মেডিক্যাল কোর হলো অন্যতম। এই আর্মি মেডিক্যাল কোরের মেজর জেনারেল রিচার্ড লিউইস একজন বিজ্ঞানী। যেহেতু তিনি মিলিটারি বিভাগে চাকরি করেন সেজন্য তাঁকে মেজর জেনারেল-এর উচ্চ পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ক্যাপসুল নিয়ে পরীক্ষাগুলি তিনিই আরম্ভ করেছিলেন। এ বিষয়ে যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা তা তিনিই আরম্ভ করেন। এই পরপর সাতটি ক্যাপসুল রিচার্ড লিউইস আকাশে পাঠালেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশ থেকে এমন কোনো হানিকর জীবাণু সংগ্রহ করা যার সন্ধান শত্রুপক্ষের জানা থাকবে না এবং যা যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে।

ইতিমধ্যে যে ছ'টি ক্যাপসুল আকাশে পাঠিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তা থেকে বলতে গেলে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। কিছু প্রশ্নের

উত্তর পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। রিচার্ড লিউইস স্থির করেছিলেন সাত নম্বর ক্যাপসুল অর্থাৎ হাইড্রাকে আকাশে পাঠিয়ে এবং তাকে ফিরিয়ে এনে যদি কোনো জীবাণু না পাওয়া যায় তবে আপততঃ এই পরীক্ষা তিনি স্থগিত রাখবেন।

সেই সাত নম্বর ক্যাপসুল হাইড্রা মেলোটাউনের কাছে নামার অল্প পরেই সম্ভবতঃ একজন ব্যতীত ঐ ছোট্ট উপনিবেশের সব লোক এবং যে দু'জন ক্যাপসুলটি তুলে আনতে গিয়েছিল তারা সকলেই মারা গেল।

হাইড্রা-এর সঙ্গে এই সব মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

সন্দেহ হওয়ার কারণ আছে। ঐ কেমিক্যাল অ্যাণ্ড বায়োলজিক্যাল বিভাগে নতুন প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল। বিজ্ঞানীরা কৃতকার্য হয়েওছিলেন। নতুন একটি ভাইরাস সৃষ্টি করা গিয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল সিওর ফিফটিটু। তবে সেই ভাইরাসের চরিত্র কি তা গোপন রাখা হয়েছিল।

এমন একটি টকসিন আবিষ্কার করা হয়েছিল যা মানুষের ত্বকের সংস্পর্শে এলে এক মিনিটের মধ্যে মানুষের মৃত্যু হবে।

এই সকল আবিষ্কারের সঙ্গে হাইড্রা-এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে?

এমন কাণ্ড অ্যামেরিকায় প্রকাশ্যে প্রায়ই ঘটে যা এখানকার খবরের কাগজেও ছাপা হয়। প্রচলিত ও জনপ্রিয় ওষুধে যেমন মাথাধরার ওষুধে তারা এমন কিছু মিশিয়ে দিলেন যা খেয়ে মাথাধরা দ্রুত সেরে গেল এবং রোগীও একটু বাড়তি আনন্দ লাভ করলো কিন্তু ঐ ওষুধটি কয়েকবার পুনরায় ব্যবহারের ফলে অন্য উপসর্গ দেখা দেয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

শুধু ওষুধে নয় নানারকম প্রসাধন সামগ্রীতেও 'কুইক অ্যাকশন' অভিহিত নানারকম রসায়ন ব্যবহার করা হয়। ঐ সব সামগ্রী পরে অ্যামেরিকায় নিষিদ্ধ করা হয় কিন্তু অ্যামেরিকা ঐ জাতীয় বিষাক্ত

ওষুধ ও প্রসাধনীগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। যাই হোক মেলোটাউনে হাইড্রা পড়ার পর এতগুলি মানুষের মৃত্যু হলো কেন? তা জানতে হবে আর এই জন্যেই ডঃ নরম্যান মারকাস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নেভাডা স্টেটের সেই গোপন ল্যাবরেটরিতে আনা হচ্ছে।

ডঃ মারকাসকে নিয়ে বোয়িং বিমান উড়ে চলেছে। তিনি তখনও ফাইলটি পড়া শেষ করতে পারেন নি। এমন সময় কোথা থেকে একজন অফিসার এসে বললো, স্যার আপনার রেডিও টেলিফোন।

ডঃ মারকাস টেলিফোন ধরলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কে কথা বলছেন?

একটি ক্লান্ত স্বর উত্তর দিল, জেনারেল সাইমন কথা বলছি, উঃ আসল যুদ্ধের সময়েও আমি কখনও এত দ্রুত কাজ করি নি। যাই হোক ২২২ নম্বর ডিভিসনের এমার্জেন্সি কল পেয়ে সকলকে জড়ো করতে পেরেছি শুধু ফিলিপ রোডস ব্যতীত।

কেন ফিলিপের কি হলো?

ফিলিপ রোডস অসুস্থ, সে হসপিট্যালে আছে। আপনি ল্যাণ্ড করার পর সব খবরই পাবেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

না, থ্যাংক ইউ।

ডঃ মারকাস টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি ভাবলেন তাঁকেও যেমন অতর্কিতে তুলে আনা হয়েছে বাকি সকলকেও তো সেইভাবেই তুলে আনা হয়েছে। কে আর জানতো যে হঠাৎ এমন অসময়ে ডাক পড়বে। যদিও তাদের বয়স্কাউটদের মতো নির্দেশ দেওয়া আছে "বি প্রিপেয়ার্ড", সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

ফিলিপ থাকলে ভাল হতো কিন্তু কি আর করা যাবে। দেখি সমস্যাটা কি? সেই বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। ফিলিপের কাজ কাউকে দেওয়া না গেলে তাকে নিজেকেই করতে হবে।

অবশ্য স্যাম চেসার আছে, ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট। সংক্রামক রোগের চিকিৎসক, তার মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল। তবে সব সময়ে

গম্ভীর একটা বিরক্তভাবে বয়ে বেড়ায়, কথা বললে ফোঁস করে ওঠে কিন্তু কাজে কখনও অবহেলা করে না।

গ্যারি হাস্টন আছে। প্যাথোলজিস্ট, অবশ্যই কাজের লোক কিন্তু মারকাসেব সঙ্গে মতে মেলে না। মজা হচ্ছে ওদের পরস্পরকে না পেলেও চলে না।

উইলিয়ম বা বিল ইয়ং আছে। খুব ভাল সার্জন। সে নাকি মানুষের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে বার কবে এনে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিতে পারে। বিল ইয়ং পরে বলেছিল সে যখন হাসপাতালে একটা এমার্জেন্সি অপাবেশন করতে হাতে ছুরি তুলে নিয়েছিল ঠিক সেইসময়ে তাকে তুলে আনা হয়েছিল।

তবে ফিলিপ রোডস থাকা খুব দরকার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই তাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফিলিপ আসলে অ্যানথ্রোপলজিস্ট কিন্তু তার উচিত ছিল গাণিতিক হওয়া। কত জটিল ক্যালকুলেশন সে চট করে এবং নির্ভুলভাবে করে দিতে পারে। তাদেবও অনেক অঙ্ক কষার দবকার হয়। কমপিউটার অবশ্যই আছে কিন্তু কমপিউটার প্রয়োগ করবার আগেই ফিলিপ অঙ্কটা কষে ফেলে।

উইলিয়ম ইয়ং বুঝতে পারে না তাকে কেন প্রজেক্ট ফেদারটাচ-এ নেওয়া হলো কারণ সে হলো একজন সার্জন কিন্তু জীবাণুবিদ স্যাম চেসার তাকে বোঝালো যে তাদের একজন সার্জনের দরকার আছে, সেটা সময়ে বোঝা যাবে। তাছাড়া বিল ইয়ং চিকিৎসা বিদ্যার অনেক কিছু জানে যথা ব্লাড কেমিস্ট্রি, পিএইচ, অ্যাসিডিটি, অ্যালকানিটি ইত্যাদি এবং তারা একজন কৃতবিদ্য, দক্ষ অথচ অবিবাহিত সার্জন খুঁজছিল।

স্যাম উত্তরে বলেছিল, প্রশ্ন কোরো না, এখানে অনেক কিছু দেখবে যা তোমার অদ্ভুত মনে হবে কিন্তু পরে তুমি সব জানতে পাববে। প্রজেক্ট ফেদারটাচ-এ শুধু মুখ বুজে কাজ করতে হবে। এখানে প্রশ্ন বা তর্কেব স্থান নেই।

সত্যিই এদের ব্যাপার স্যাপার অবাক হবার মতো। রোগী অপারেশন টেবিলে শুয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে, বিল হাতে ছুরি তুলে নিয়েছে এমন সময় তার ডাক পড়ল, এখনি এই মুহূর্তে যেতে হবে।

অতএব ছুরি নামিয়ে রেখে অন্য এক সার্জনকে ভার দিয়ে পোশাক ছেড়ে দু'চারটে দরকারি জিনিস নিয়ে ডঃ মারকাসের মতো একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে নীল রঙের মিলিটারি সিডান দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ির সামনে যেতেই আর একজন মিলিটারিম্যান তাকে স্যালুট করে ডান হাত পেতে বললো, আপনার আইডেনটিটি কার্ড, প্লিজ।

বিল ইয়ং আইডেনটিটি কার্ড বার করে দিলো যাতে তার নাম, পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি লেখা আছে আর আছে তার ফটোগ্রাফ ও টিপছাপ। মিলিট্যারিম্যান সেটি দেখে বিলকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, ঠিক আছে স্যার গাড়িতে উঠুন।

গাড়িতে উঠে বিল দেখলো স্যাম চেসার বসে আছে, ভেতরে লাল আলো জ্বলছে।

গাড়ি ছেড়ে দিলো। স্যাম চেসার বললো, আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছলে তোমাকে একটা ফাইল দেওয়া হবে, সেটা মন দিয়ে পড়বে। এয়ার-পোর্ট ? আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

এফ হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড ফোর।

সে আবার কোথায় ?

নেভাডা, অপারেশন ফেদারটাচ-এর ল্যাবরেটার। প্লেনে উঠে ফাইলটা পড়বে। ল্যাবরেটরিতে পৌঁছেই কাজ আরম্ভ করতে হবে ?

কি কাজ ?

তা আমিও জানি না, শুধু জানি আর সকলে আমাদের আগে চলে গেছে, তারা এখন বোধহয় অ্যারিজোনায় পাইডমণ্টে হেলিকপটার থেকে নামছে, কেবল ফিলিপ রোডস যেতে পারে নি, সে হসপিট্যালে, তার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হবে।

বিল জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সেখানে আগে গিয়েছিলে ?

না যাই নি তবে বোকা সাজছ কেন ? এটা তো প্রজেক্ট ফেদারটাচ-এর ল্যাবরেটরি।

'ওঃ হো, আমি তোমার সব মন দিয়ে শুনি নি, আমি হসপিট্যালে সেই রোগীব কথা চিন্তা করছিলুম।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৯টা বেজে ৫৯ মিনিটে ভ্যাণ্ডেনবার্গেব এম-এস-এইচ হ্যাঙ্গার থেকে একটা বড় হেলিকপটার আকাশে উঠলো। এম-এস-এইচ-এর অর্থ হলো ম্যাকসিমাম সিকিউরিটি হ্যাঙ্গার। এই হ্যাঙ্গারে হেলিকপটার যাওয়া আসা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়। বাইরের লোক যেন টের না পায় এখান থেকে হেলিকপটার কখন ছাড়ছে বা এসে পৌঁছচ্ছে।

এক্ষেত্রে গোপনীয়তা নেবার বিশেষ দরকার ছিল। কারণ ঐ বিমানে এমন দু'জন যাত্রী ছিল এবং পাইলটকেও এমন প্লাস্টিকের বিশেষ পোশাক পরতে হয়েছিল যা দেখে তাদের বেলুনের পুতুল বলে মনে হতে পারে। এমন পোশাক সাধারণের মনে কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। এই জন্যেই বিশেষ সতর্কতা।

হেলিকপটারটি যাবে পুব দিকে, অ্যারিজোনায়। আকাশ পরিষ্কার। হেলিকপটার আকাশে উঠে পাইডমণ্টের দিকে চললো। পাইডমণ্টের কাছেই মেলোটাউন যেখানে হাইড্রা পড়েছে।

হেলিকপটারে যে দু'জন যাত্রী ছিল তারা হলেন ডঃ নরম্যান মারকাস এবং অপরজন গ্যারি হাস্টন। হাস্টনকে আনা হয়েছে হিউস্টনের বেলর ইউনিভারসিটি থেকে। তিনি বেলর মেডিক্যাল ইসকুলের প্যাথোলজির প্রফেসর এবং হিউস্টনে নাসা সংস্থার বিশেষ উপদেষ্টা। বয়স চুয়ান্ন। চেহারার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, পোশাক ঢিলেঢালা। জীবাণুরা কি ভাবে মানুষের দেহের ভেতরে কোষকলা বা টিস্যুসমূহ আক্রমণ করে তাদের ক্ষতি সাধন করে এবং সেজন্য মানুষ কি ভাবে রোগাক্রান্ত হয় এই হলো তাঁর গবেষণার মূল বিষয়। জীবাণুরা কিভাবে কোনো কোনো

মোক্ষম ওষুধ যথা সালফা ড্রাগ বা পেনিসিলিনকে প্রতিরোধ করতে শেখে তা নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। মানুষের সঙ্গে এইসব ক্ষুদ্র জীবাণুর জোর সংগ্রাম চলছে। মানুষ এক জীবাণুকে আয়ত্ত করে তো আর এক নতুন জীবাণুর সৃষ্টি হয়।

হেলিকপটার উড়ে চলছে। তার খোলের মধ্যে বসে বিজ্ঞানী দু'জন কথা বলছেন। ডঃ মারকাস বললেন, হাইড্রা নামবার পরই পঞ্চাশ জন লোক মারা গেছে। সাংঘাতিক কোনো একটা সংক্রমণ নিমেষে ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্যারি হাস্টন বললো, নিশ্চয়ই বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, সংক্রমণটা আকাশ থেকে এসে থাকবে।

মারকাস বললেন, তাই হবে।

গ্যারি হাস্টন বললো, সব ক'জনই মরেছে মেলোটাউনের মধ্যে। মেলো-টাউনের বাইরে কোনো মৃত্যুর সংবাদ এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে কি?

মারকাস মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, এখনও তেমন কোনো রিপোর্ট পাই নি তবে আমি মিলিটারিকে খোঁজ নিতে বলেছি। বড় রাস্তায় আমাদের সিকিউরিটির যেসব গার্ড পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে মিলিটারি খোঁজ খবর চালাচ্ছে।

গ্যারি হাস্টন জিজ্ঞাসা করলো, বাতাস, মানে কোন্‌দিকে বইছিল?

ভাগ্য ভাল, মারকাস বললেন সে রাত্রে বাতাসের গতি ছিল দক্ষিণ দিকে, ঘণ্টায় মাত্র ন' মাইল কিন্তু মাঝরাত্রি থেকে সে বাতাসও বন্ধ হয়ে যায়। আবহাওয়া অফিস বলেছে এই সময়ের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক।

স্বাভাবিক হোক আর অস্বাভাবিক হোক অনেক মানুষ ও পশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে, গ্যারি বললেন।

সেটা ঠিক তবে একশ মাইল ব্যাসের মধ্যে কোনো গ্রাম বা শহর নেই তারপরে কয়েকটা শহর আছে। বাতাস একটু জোরে বইলে কি যে হ'তো বলা যায় না, বাতাসটা এখনও প্রায় বন্ধই আছে, মারকাস

বললেন।

সেটা ভাল লক্ষণ, গ্যারি বললেন।

এরপর বিজ্ঞানী দু'জন জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরির কমপিউটার ডিভিসন কিছু মানচিত্র তৈরি করে দিয়েছিল ওরা সেগুলি লক্ষ্য করে নিজ নিজ মন্তব্য পেশ করতে লাগলেন।

সেই বিভীষিকার রাত্রে ভ্যানের মধ্যে মাইকেল হারভে এবং টম পিয়ার্সের কথাবার্তার টেপ ওরা মনোযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং অন্য বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমেও শুনেছিলেন। দু'জনে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন, লোকগুলো হঠাৎই মারা গেছে হয়তো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

গ্যারি বললেন, ধারালো ক্ষুর দিয়ে মানুষের গলায় জুগুলার আর ক্যারোটিড শির একসঙ্গে কেটে দিলেও তার অজ্ঞান হতে সময় লাগে দশ থেকে চল্লিশ সেকেণ্ড আর মরতে আরও এক মিনিট।

কিন্তু মেলোটাউনে ওরা বোধহয় এক থেকে দুই সেকেণ্ডের মধ্যে মরেছে, আমার তাই মনে হয়, মারকাস বললেন।

গ্যারি বললেন, হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হলেই মানুষ মরে না, ব্রেনের কাজ বন্ধ হলেই তবে মানুষ মরে। এদের ব্রেনের ভেতরে কিছু একটা সহসা আঘাত করেছিল।

মারকাস বললেন, কি? নার্ভ গ্যাস?

খুবই সম্ভব, নার্ভ গ্যাস খুব দ্রুত কাজ করে, ফুসফুসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, ত্বকের ভেতর দিয়ে এবং মুখের ভেতর দিয়ে তো বটেই শরীর যেন ঐ গ্যাস শুষে নেয়। আমাদের এই প্লাস্টিক স্যুট নার্ভ গ্যাস প্রতিরোধ করতে পারে কি?

সেইভাবেই তো তৈরি তবে ওখানে এখনও বাতাসে যদি নার্ভ গ্যাস থেকে থাকে তো আমরা শীঘ্রই তার প্রমাণ পাব।

হেলিকপটারের পাইলট ইণ্টারকম মারফত বললো, সামনে মেলোটাউন স্যার এবার বলুন কি করবো?

মারকাস বললেন, মেলোটাউনের ওপর বার কয়েক চক্কর মারো, আমরা নিচেটা আগে একবার দেখব।

পাইলট মেলোটাউনের ওপর পৌঁছে খানিকটা নিচে নেমে চক্কর দিতে লাগলো। ওরা দেখতে পেল কয়েকটা শকুনি কয়েকটা মৃতদেহ ছেঁকে ফেলেছে।

গ্যারি হাস্টন বললো, আরে লোকগুলো যদি কোনো জীবাণুর আক্রমণে মরে থাকে তাহলে শকুনিগুলো ওদের দেহ থেকে মাংস খুবলে নিয়ে চারদিকে ছড়াবে সেই সঙ্গে রোগও ছড়াবে, সে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে।

মারকাস বললো, তাহলে ওগুলোকে মেরে ফেলা যাক, আমাদের সঙ্গে তো গ্যাস আছে, ওহে পাইলট গ্যাস এনেছ তো?

আছে স্যার বলুন কি করবো।

কলোনির ওপর গ্যাস ছাড়।

পাইলট হেলিকপটার একটু হেলিয়ে গ্যাসের ক্যান থেকে কলোনির ওপর গ্যাস ছাড়তে লাগলো।

গ্যারি জিজ্ঞাসা করলো এটা কি গ্যাস?

ক্লোরাজাইন, গ্যাসটা জমির ওপর খুব ভাল কাজ করে, পাখি মারতে ওস্তাদ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কলোনিটা পাতলা কুয়াসায় ঢেকে গেল এবং সে কুয়াসা পরিষ্কার হতে বেশি সময় লাগলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্যাস উঠে গেল। শকুনিগুলোর মরা দেহ পড়ে রইল।

পাইলট আবার ইণ্টারকম মারফত জিজ্ঞাসা করল, এবার কি অর্ডার স্যার?

মারকাস বললেন শহরের মাঝখানে চল মাটি থেকে যখন তুমি কুড়ি ফুট ওপরে থাকবে তখন মই নামিয়ে দেবে। আমরা যখন নেমে যাব তখন তুমি মই গুটিয়ে নিয়ে পাঁচশো ফুট ওপরে উঠে যাবে তারপর আমরা সিগন্যাল করলে তুমি ফিরে আসবে। আর আমাদের যদি কিছু ঘটে তুমি তোমার স্টেশনে ফিরে গিয়ে প্রজেক্ট ফেদারটাচ-এ ফোন করবে, বুঝতে

পেরেছি স্যার।

হেলিকপটার নিচে নামতে লাগলো আর ওরা দু'জন ওদের প্লাস্টিক স্যুট ফোলাতে আরম্ভ করল। দু'জনেরই পিঠে অকসিজেনের বোতল আটকানো আছে। দু'জনে মাথায় হেলমেট পরলো। গ্যাসমাস্ক পরতে হলো না। কারণ তা ওদের বেলুন স্যুটের সঙ্গেই ফিট করা আছে।

কুড়ি ফুট বাকি থাকতে পাইলট হেলিকপটার থামিয়ে মই নামিয়ে দিলো। প্রথমে মারকাস নামলেন। পরে হাস্টন। -

পাইলট দেখে নিল ওরা দু'জনেই নেমে পড়েছে, তখন ও মই গুটিয়ে নিয়ে ওপরে উঠলো।

মারকাস বললো, চলো তাহলে আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক।

ওরা কখনও বেলুন স্যুট পরে নি। প্রথমে চলতে অসুবিধে হচ্ছিল তারপর ঠিক হয়ে গেল।

গতরাত্রে মাইকেল হারভে আর টম পিয়ার্সের শেষ বাড়ির বারো ঘণ্টার মধ্যে ওরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। কি দ্রুতগতিতেই না মিলিটারি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

সূর্য এখনও আকাশের নিচের দিকেই রয়েছে। বেশ শীত, কনকনে ঠাণ্ডা বলা যায়। রাস্তায় অনেক জায়গায় বরফ জমে রয়েছে, খুব আস্তে বাতাস বইছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, না শোনা যাচ্ছে কুকুরের ডাক বা শিশুর ক্রন্দন।

ওদের যে ফাইল পড়তে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে ওরা মূল দুটো তথ্য পেয়েছে। হাইড্রা ল্যাণ্ড করেছে এবং তারপর কলোনির সব লোক মরে গেছে।

প্রথম কথা বললো মারকাস, গ্যারি, সবাই বাইরে এসে মরেছে কেন? সকলেরই তো পরনে দেখছি পাজামা স্যুট। যদি কোনো মড়ক লেগে থাকে তো ওরা তো ঘরের ভেতরে থাকবে, এত শীতে শুধু পাতলা পাজামা স্যুট পরে বাইরে আসবে কেন?

গ্যারি বললো, নিশ্চয় কোনো তাড়া ছিল কিন্তু কিসের তাড়া! মারকাস দু'হাত নেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, জানি না, হয়ত কিছু দেখতে

বাইরে এসেছিল।

গ্যারি বললো, এই দেখ, এই দেখ, এরা সকলে দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, কি ব্যাপার বল তো নরম্যান ?

ডঃ মারকাস বললেন, বুক চেপে ধরলে কি হবে কারও মুখে কিন্তু বেদনার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, করোনারি অ্যাটাক ?

গ্যারি বললো, সে তো যন্ত্রণাদায়ক তবে হঠাৎ হার্টফেল করলে যন্ত্রণা অনুভব করবার আগেই মানুষ মরে যায়। এ মানুষগুলো মরবার সময় কোনো যন্ত্রণা অনুভব করে নি, ওরা নিশ্বাস নিতে পারছিল না, আকস্মিক দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মারকাস বললো, তাতেও আমার সন্দেহ আছে। মানুষের শ্বাসকষ্ট হলে সে প্রথমে তার গলার বোতাম আলগা করে কিন্তু এই লোকটিকে দেখ, টাই পরে রয়েছে, আলগা করে নি, আর ঐ মহিলাকে দেখ, গায়ে হাইনেক ব্যানলন। উনিও তো গলায় হাত দেন নি।

এই মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করে একসঙ্গে এতগুলি মৃতদেহ এবং শকুনি দ্বারা কয়েকটি ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে খারাপ লাগা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু ওরা বিজ্ঞানী তাই প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

এতক্ষণ ওরা যা চিন্তা করছিল তা সবই এলোমেলো, যেন ঘোলাটে। ক্রমশঃ তারা স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলো।

ভ্যাণ্ডেনবার্গ থেকে প্রেরিত ভ্যানটা একদিকে পড়েছিল যার মধ্যে মাইকেল ও টম মরে পড়ে আছে। আলো তখনও জ্বলছিল তবে ব্যাটারি কমে যাওয়ায় দুর্বল। মারকাস আলো নিবিয়ে দিলেন।

মাইকেল বা টমের নাম জানলেও কে মাইকেল বা কে টম তা ওরা জানত না। কিন্তু এখন দেখল দু'জনেরই ইউনিফর্মে নাম লেখা রয়েছে। মাইকেল গাড়ি চালাচ্ছিল আর পিছনে বসেছিল টম।

স্টিয়ারিং হুইলের সামনে থেকে ডঃ মারকাস মাইকেলের লাশটা সরিয়ে বললেন, গাড়িটা কি চলবে ?

চলা তো উচিত, দেখই না, গ্যারি বললেন।

তাহলে ক্যাপসুলটা তুলে আনা যেত, এটাই আমাদের প্রথম কাজ, বাকি কাজগুলো পরে করা যাবে।

ড্রাইভারের সিটে বসতে যাবার আগে ডঃ মারকাস লক্ষ্য করলেন মাইকেলের নাকের ওপর দিয়ে একটা ক্ষতচিহ্ন, সম্ভবতঃ মুখটা স্টিয়ারিং হুইলে সজোরে ঠুকে গিয়েছিল কিন্তু কোথাও রক্তর চিহ্ন নেই।

কথাটা তিনি গ্যারিকে বললেন। গ্যারি গাড়িতে উঠে এসে মাইকেলের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে অবাক। মাইকেল যেভাবে আঘাত পেয়েছে তাতে প্রচুর রক্তপাত হওয়ার কথা কিন্তু এক বিন্দু রক্ত নেই। আশ্চর্য কাণ্ড।

ডঃ মারকাসও বললেন, যে লাশগুলো শকুনিরা ঠুকরেছে সেগুলোতেও তো রক্ত দেখি নি!

আমিও তাই ভাবছি, গ্যারি বললেন, তবে চল আমরা আগে ক্যাপসুলটা তুলে আনি তারপর এ বিষয়ে দেখা যাবে। ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

গ্যারি গাড়ি থেকে মাইকেল ও টমের লাশদুটো বার করে মাটিতে শুইয়ে রাখলো।

মারকাস গাড়িতে স্টার্ট দিলো কিন্তু এঞ্জিন স্টার্ট নিলো না। গ্যারিকে বললো, ব্যাটারি বোধহয় ডাউন হয়ে গেছে।

গ্যারি বললো, গাড়িতে তেল আছে তো হে?

সত্যিই তো? ওরা খেয়াল করে নি। গাড়িতে তেল নেই। ওরা দু'জনে তখন পেট্রল স্টেশনে গিয়ে খুঁজে পেতে একটা টিন বার করে পাম্প থেকে তেল এনে গাড়িতে ঢাললো। এবার গাড়ি স্টার্ট নিলো।

গ্যারি গাড়ির ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চালু করে দিলো। ক্যাপসুলের বিপ্ বিপ্ শোনা যেতে লাগলো, সে শব্দও দুর্বল, বাঁ দিকে কোনো জায়গা থেকে আসছে।

মেলোটাউনের ভেতরে গাড়ি খানিকটা এগিয়ে যেতে বিপ্ বিপ্ আওয়াজ বেশ জোর হলো কিন্তু আর একটু এগোতে আওয়াজ আবার কমে গেল।

গ্যারি বললো, কাছেই কোথাও ক্যাপস্যুলটা আছে, আমরা ছাড়িয়ে এসেছি, ফিরে চলো। ওরা আবার ফিরে এলো। একটা বাড়ির সামনে আওয়াজ বেশ জোর হলো।

গাড়ি থামিয়ে ওরা নামলো। সামনেই কাঠের বাড়ি, দরজায় সাইনবোর্ড ডঃ হেনরি টুচম্যান। ওদের মনে হলো ক্যাপস্যুলটা এই বাড়ির ভেতরেই আছে। কিন্তু এখানে সেটা আসবে কি করে?

চল তো হে ডাক্তারের বাড়ির ভেতরটা একবার দেখি, ডঃ মারকাস বললেন।

দরজা খোলাই ছিল। ওরা ভেতরে ঢুকলো। প্রথম ঘরখানা ছোট। এটা রোগীদের অপেক্ষা করার ঘর। চারজন বসার মতো গদি আঁটা একখানা লম্বা শোফা আর সামনে ছোট একটা টেবিলে কয়েকখানা পত্রিকা রয়েছে। পাশেই একটা দরজা। পর্দা ফেলা।

ওরা দু'জনে পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকলো। ঢুকতেই বোঝা গেল এটাই ডাক্তারের চেম্বার। টেবিলের ওপর ডাক্তারের ব্যাগ, স্টেথিসকোপ, দু'একটা ওষুধ। দেওয়ালে আলমারিতেও কিছু ওষুধ ও যন্ত্রপাতি রয়েছে। একটা সুইভেল চেয়ারে ডাক্তার বসে, বয়স আন্দাজ ষাট, মাথার চুল সাদা, গায়ে ড্রেসিং গাউন, সামনে দু'খানা ডাক্তারী বই খোলা রয়েছে। ডাক্তার ঘরের একটা কোনের দিকে চেয়ে কিছু ভাবছিল আর সেই সময়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদের মতো ডাক্তার বাইরে বেরোয় নি। ডাক্তার যে দিকে চেয়ে ছিল সেইদিকে চাইতেই ক্যাপস্যুলটা দেখা গেল।

একটা ত্রিকোণ সামগ্রী, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে। তিন ফুট মতো লম্বা হবে। গায়ে কিছু ক্ষত চিহ্ন। নিচে একটা প্লায়ারর্স আর একটা ছেনি পড়ে রয়েছে। ক্যাপস্যুলটার দিকে একটু লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল ক্যাপস্যুলের একটা জোড়ের মুখ, যেখানটা একটু ফাঁক রাখা থাকে, সেখানটা কেউ ঐ প্লায়ারর্স আর ছেনির সাহায্যে খোলবার চেষ্টা করেছিল।

ডঃ কসমস বললেন, সব মূর্খ কোথাকার। এখানে আগেই জানান

হয়েছিল কাল রাত্রে এই সময়ে একটা ক্যাপস্যুল কাছে কোথাও পড়বে সেটা কেউ যেন না তোলে। আমাদের লোক এসে তুলে নিয়ে যাবে তবুও ওরা হাত দিলো কেন?

গ্যারি বললো, সঙ্গে সঙ্গে চরম সাজাও পেলো, এরা সবাই শিক্ষিত লোক।

শিক্ষিত বলেই এই দশা হলো, অশিক্ষিত হলে ভয়ে হাতই দিত না, নিশ্চয় থানায় খবর দিত। কেউ এটা আগেই খোলবার চেষ্টা করেছিল এবং পরে ডাক্তারের বাড়িতে তুলে এনেছে। ভেবেছিল ডাক্তার হয়ত এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে, ডঃ মারকাস বললেন।

গ্যারি বললো, তাহলে কি যারা তুলে আনছিলো তাদের সোরগোলে সব লোক বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল? তাই বা কি করে হয়? এই শীতে একটা পাতলা পাজামা স্যুট পরে তারা বাইরে বেরোবে কেন? যারা তুলতে গিয়েছিল তাদের গায়ে অন্ততঃ গরম পোশাক থাকা উচিত ছিল অথচ বাইরে যারা মরে পড়ে রয়েছে তাদের কারও গায়ে তেমন পোশাক নেই। তাহলে কি ডাক্তার নিজেই ওটা তুলে এনেছিল? ওর গায়ে অন্ততঃ উলের একটা ড্রেসিংগাউন আছে। ডাক্তারই যদি তুলে আনলো এবং নিজে খোলবার চেষ্টা করলো তাহলে কলোনির সব লোক বাইরে বেরিয়ে এলো কেন?

ডঃ শারকাড আর একটা প্রশ্ন তুললেন। যাই হোক সে ক্যাপস্যুলটা তুললো কখন? আমাদের ভ্যান তো টহল দিচ্ছিলো। মাইকেল আর টমের কথা শুনে বোঝা যায় ওরা ক্যাপস্যুলটা আনতে যাচ্ছিল?

গ্যারি হাস্টন বললো আমাদের লোকেরা ভ্যান থেকে বেরিয়ে ক্যাপস্যুল আনবার আগেই ডাক্তার বোধহয় তুলে এনেছিল। তবুও বলবো স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

গ্যারি তুমি ভাই প্ল্যাস্টিক খোলটা বার করে আগে ক্যাপস্যুলটা তুলে ফেল, ওটার জন্যেই আমাদের আসা।

গ্যারি তার স্যুটের বিরাট পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা মোটা প্ল্যাস্টিক বার করলো। সেটা খুলে তার ভেতরে দু'জনে মিলে ক্যাপস্যুলটা ভরে

ফেলে বেশ করে মুখ বন্ধ করে সীল করে দিলো। তখন বাইরের কিছু ভেতরে ঢুকতে পারবে না, ভেতর থেকেও কিছু বাইরে বেরোতে পারবে না। সেটা ওরা আপাততঃ একপাশে রেখে দিলো।

গ্যারি হাস্টন বললো, ডাক্তারকে একবার দেখা যাক। মনে হচ্ছে ক্যাপসুলটা সে স্পর্শ করেছিল।

ডাক্তারকে একটু ঠেলা দিতেই মেঝেতে পড়ে গেল।

গ্যারি বললো, আমরা দেখেছি ভ্যানের মধ্যে মাইকেল মারা গেছে, তার মুখে ও কপালে ক্ষত চিহ্ন কিন্তু কোথাও রক্ত নেই। এটা ডাক্তারের চেম্বার, আলমারিতে নিশ্চয় ডাক্তারী ছুরি স্কালপেল আছে। আমি ওর দেহ কয়েক জায়গায় চিরে দেখতে চাই রক্ত বার হয় কি না। মরে গেছে, হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোবেনা তবুও রক্ত তো থাকবে।

ডঃ মারকাস আলমারি খুলে ডাক্তারের সার্জিক্যাল বক্স বার করলেন। গ্যারি বললো, সাবধান ডক্টর, দেখো যেন স্কালপেলে আমাদের স্যুট কেটে না যায় তাহলে বিপদ ঘটবে।

কোনো মানুষ বিছানায় শুয়ে মরে গেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে দেহের সব রক্ত পিঠের নিচের দিকে জমা হয়, দেহ নীল হয়ে যায়। ডাক্তার যখন মরেছে তখন সে বসে ছিল, অতএব কোমরে রক্ত জমা হওয়া উচিত এবং বাকি দেহ নীল হয়ে যাওয়াও উচিত।

ওরা ডাক্তারের দেহ থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেললো কিন্তু দেহের কোনো অংশ নীল হয় নি।

ডঃ মারকাস সাবধানে স্কালপেল বার করে গ্যারি হাস্টনের হাতে দিলো। কব্জির বেডিয়াল ও আলনা শিরা খুবই স্পষ্ট। গ্যারি সেই দুটি শিরা কাটলো এবং খানিকটা চামড়া তুলে ফেললো। বিন্দু মাত্রও রক্ত-পাত হলো না। খানিকটা জমাট বাঁধা কালচে লাল পদার্থ বেরোল।

আরে? এ আবার কি? রক্ত রীতিমতো দানা বেঁধে গেছে? ডঃ মারকাস বললেন।

শরীরের আরও কয়েকটা জায়গা কেটে দেখা হলো। সর্বত্রই রক্ত জমাট

বেঁধে গেছে। শহরের জল সরবরাহের সমস্ত পাইপগুলোর জল যেন জমে বরফ হয়ে গেছে।

গ্যারি হাস্টন তো রীতিমতো উত্তেজিত। সে বললো, আমি ডাক্তারের হার্ট আর লাংস দেখতে চাই।

তুমি কি পোস্টমর্টেম করছ নাকি? কিন্তু হার্ট আর লাংস ওপেন করবে কি করে?

ঐ তো ধারালো ছেনিটা পড়ে রয়েছে, ঐটা দিয়ে, বলে গ্যারি প্লায়ার্সের পাশ থেকে ছেনিটা তুলে নিলো। তারপর স্কালপেল দিয়ে বুকের অনেকটা চামড়া কেটে তুলে দিয়ে সেই ছেনি দিয়ে কয়েকটা পাঁজর ভেঙে দিল।

এমন দৃশ্য দেখতে ডঃ মারকাস অভ্যস্ত নন, তাঁর খুব খারাপ লাগছিল।

এরপর গ্যারি হাস্টন ডাক্তারের হৃদযন্ত্রের বাঁ দিকের একটা অংশ চিরে দিলেন। রক্ত কোথায়? স্পঞ্জের মতো লাল চ্যাটচেটে পদার্থে ভেতরটা ভর্তি।

দু'জনেই অবাক। এমন কোনো ঘটনা দেখা দূরের কথা তাঁরা কখনও শোনেন নি। দেহের সমস্ত রক্ত কি করে জমাট বেঁধে যেতে পারে? যাই হোক অভাবনীয় কিছু একটা দেখা গেল। কারণটা খুঁজে বার করতে হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে। শরীরের ভেতরে কোনো বিশেষ টকসিন সৃষ্টি হলে যে এমন হতে পারে না তা বলা যায় না কিন্তু তেমন টকসিন কোথায়? আছে বলে জানা যায় নি।

ডঃ মারকাস ডাক্তারের কাটা ছেঁড়া দেহটা বোধহয় সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি ক্যাপসুলটা তুলে নিয়ে ভ্যানে রেখে এসে বললেন, চল গ্যারি আমরা বাড়িগুলো সার্চ করে আসি।

তাহলে এই ঘর থেকেই আরম্ভ করা যাক, গ্যারি প্রস্তাব করলো।

তাই করা যাক, ডঃ মারকাস সায় দিলো।

পাশের ঘরে মাঝবয়সী একজন মৃত মহিলা চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। বইখানা তাঁর কোলের ওপর ছিল, হয়তো পাতা ওলটাতে যাচ্ছিলেন। মহিলা সম্ভবতঃ ডাক্তারের স্ত্রী।

তারও পাশের ঘরে বিছানায় বারো তেরো বছরের একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে শুয়ে রয়েছে। মৃত্যু তাকেও রেহাই দেয়নি। তার চোখ দুটি খোলা। তার হাতে একটা খেলনা এরোপ্লেনের একটা অংশ ধরা রয়েছে। বাঁ হাতে একটা আবার টিউব।

পরপর কয়েকটা বাড়ি ওরা দেখল। কেউ বেঁচে নেই। গ্যারি হাস্টন কারও কব্জি, কারও পায়ের শির কেটে দেখতে লাগলো। কোথাও এক ফোঁটাও রক্ত পড়ল না। রক্ত জমে গেছে।

একটা বাড়িতে পরিবারের চারজন, বাবা, মা, ভাই, বোন যখন ডিনার টেবিলে বসে রাত্রের আহার গ্রহণ করছিল সেই সময়, মৃত্যু তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। দৃশ্যটা দেখে মনে হয় যেন সিনেমার ফ্রিজ শট।

একটা বাড়িতে দেখা গেল এক বৃদ্ধা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। আত্ম-হত্যা করেছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে, 'ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।' বৃদ্ধা কোন্ সময়ে আত্মহত্যা করেছে জানা গেল না।

একজন লোক, তার নাম রে হল্যাণ্ড। সে পেট্রল পাম্পের কর্মী। বাথরুমে ছেড়ে রাখা তার ইউনিফর্মে নাম লেখা ছিল। সে বাথটবে জল ভর্তি করে এক পা বাথটবে ঢুকিয়েছে আর সেই সময়ে মারা গেছে।

আরও একটি মহিলা আত্মহত্যা করেছে। সে তার সেলাইকলে সেলাই করছিল। সেলাই ফেলে রেখে একখানা কাগজে লিখেছে "পৃথিবী শেষ হয়ে আসছে"। পাশে পেট্রলের একটা খালি টিন আর দেশলাই পড়ে ছিল। সেই টিনের পেট্রল পায়ে ঢেলে দেশলাই জ্বেলে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুধু দু'জন মেয়ে নয় একজন পুরুষও আত্মহত্যা করেছে। নিজের রিভল-ভার দিয়ে রগে গুলি করেছে। সেখানে একটা গর্ত, কোনো রক্তপাত হয় নি। লোকটি সম্ভবতঃ যুদ্ধে গিয়েছিল। তার সামনে টেবিলে একটা টেপরেকর্ডার চালিয়ে শোনা গেল সে নিজে সৈন্য পরিচালনা করছে, তারই একটা ধারাবিবরণী।

ওরা আরও একটু ঘুরে আর কয়েকটা মৃতদেহ দেখল। ওরা দু'জনেই রীতিমতো শিক্ষিত ও সাহসী মানুষ তা নইলে সাধারণ কোনো মানুষ

হলে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতো অথবা দু'তিনটে মৃতদেহ দেখে আর দেখতে সাহস পেতো না।

ডঃ মারকার বললেন, দেখেছ গ্যারি কেউ সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে মরেছে, কেউ কিছু পরে, আত্মহত্যা করার কেউ সময় পেয়েছে।

গ্যারি হাস্টন বললো, সে তো বটেই কারণ প্লেন থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে তাতে তো একজনকে নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। সে তো অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলো কোন্ লোকটা তা কিন্তু জানা গেল না, কারণ বাইরে অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

ডঃ মারকাস বললেন, নাকি কোথাও বেঁচে আছে, সব ঘর তো আমরা দেখি নি।

সব ঘর আমাদের দেখবার সময় নেই ডঃ মারকাস, এবার ফেরা যাক। ওরা এবার ফেরবার উদ্যোগ করলেন। ক্যাপসুলটা নেবার জন্যে ভ্যানের দিকে কয়েক পা এগোতেই ওদের পা যেন জমিতে আটকে গেল।

শিশুর ক্রন্দন।

ওরা প্রথমে মনে করেছিল বাতাসের শব্দ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল। স্পষ্ট শিশুর ক্রন্দন তবে জোরে নয়, যেন ক্লান্ত একটা ছোট্ট শিশু কোথাও কাঁদছে। ওরা হতভম্ব ও আশ্চর্য। শিশুটি কেঁদেই চলেছে, মাঝে মাঝে কাশছে।

কান্নাটা কাছেই কোনো বাড়ি থেকে আসছে। একটু দূর থেকে। ওরা খুঁজতে আরম্ভ করল কোন্ ঘর থেকে কান্না আসছে। কিন্তু কান্না থেমে গেল।

ওরা থেমে গেল, দম নিতে লাগল। দু'জনেই উত্তেজনায় কাঁপছে। নির্জন ও নিস্তব্ধ রাস্তার মাঝখানে দু'জনেই দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমরা কি ভুল শুনলুম? ডঃ মারকাস প্রশ্ন করলেন।

গ্যারি হাস্টন বললো, নিশ্চয় না, আবার কাঁদবে।

গ্যারির অনুমান ঠিক। শিশু আবার কান্না আরম্ভ করলো। এবার আরও জোরে যেন প্রতিবাদের স্বর।

বেশি দূরে নয়। ডাক্তার টুচম্যানের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই। বাড়ির সামনে বুক চেপে ধরে একজন যুবক ও যুবতী মরে পড়ে রয়েছে।

ওরা বাড়ির ভেতরে শোবার ঘরে ঢুকেই শিশুটিকে দেখতে পেল। তার কান্না, সারা ঘর ভরে গেছে। খুবই ছোট দু' তিন মাসের বেশি বয়স হবে না।

শিশুটি তার ছোট্ট খাটে শুয়ে রয়েছে, বুকের ওপর ছোট কম্বল ঢাকা। ছেলেটি পুরুষ। বেচারা। ছোট্ট বিছানা নোংরা করে ফেলেছে তার ওপর বারো ঘণ্টার বেশি কিছু খেতে পায় নি। কাঁদবেই তো।

তবুও ঘরে দু'জন মানুষ দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল কিন্তু তাও ক্ষণিকের জন্যে।

গ্যারি শিশুটিকে তুলে নিলো। তাকে পরিষ্কার করলো। একটা ছোট আলমারি ছিলো, যার পাল্লায় শিশুর হাসিমুখ আঁকা। সেই আলমারি খুলে ওরা তার পোশাক বার করে পোশাক পরিয়ে দিল।

শিশু কেঁদে চলেছে। গ্যারি তাকে দোলাচ্ছে কিন্তু থামবে কেন? পেটে তার রাক্ষুসে ক্ষিধে।

ডঃ সাইমন বললেন, ওর তো বেবিফুড রয়েছে, তৈরি করে খাইয়ে দোব নাকি?

আরে না, না, গ্যারি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের স্বরে বললো, এই টাউনের কিছু ওকে আপাততঃ খাওয়ানো উচিত হবে না। কে জানে যারা সঙ্গে সঙ্গে মরেছে তারা হয়তো সবে ডিনার করেছিল, যারা তখনও খায় নি তারা দেরিতে মারা গেছে, তাছাড়া এখানে খাওয়ালে কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে? তার চেয়ে যাক বাবা আমরা ওকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো।

ডঃ মারকাস বুঝলেন, গ্যারি ঠিক কথাই বলেছে। শিশুটাকে বাঁচাতেই হবে। কিসে ও বেঁচে রইল সেটা জানা দরকার।

শিশু যেন ওদের কথা বুঝতে পেরেছে। গ্যারির দিকে ক্ষুদে নীল চোখে চেয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চুষতে লাগলো।

ডঃ মারকাস বললেন, বেচারা! কি ঘটেছে তা বলতে পারবে না।

গ্যারি গম্ভীরভাবে বললো, বলতেও তো পারে।

হেলিকপ্টার তখনও আকাশে। ওরা শিশুকে নিয়ে রাস্তায় এল। গ্যারির কোলে শিশু। ডঃ সাইমন ভ্যান থেকে ক্যাপসুলটা বার করে হেলিকপটারকে সংকেত করলেন।

হেলিকপটার নেমে এল। সঠিক উচ্চতায় থেকে পাইলট মই নামিয়ে দিলো। ওরা মইয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং আর একজন জীবিত মানুষ দেখতে পেলেন।

রোগা একজন বৃদ্ধ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, সাদা, মুখের ও কপালের চামড়া কুঞ্চিত। গায়ে একটা নাইটগাউন, ধুলো ও ময়লার ছাপ। পায়ে জুতো নেই।

টলতে টলতে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

ডঃ মারকাস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

বৃদ্ধ উত্তর দিল, এই কাণ্ড তাহলে তোমরাই করেছ?

তোমার নাম কি?

আমাকে মেরো না···আমি ওদের মতো নই।

বিজ্ঞানী দু'জনের পরণে প্লাস্টিকের বেলুন স্যুট। বৃদ্ধ এমন পোশাক কখনও দেখে নি। সে আতংকিত হয়ে ছিলই, এখন ভয়ে কাঁপছে। তার ধারণা লোক দু'জন মার্স গ্রহ থেকে নেমে এসেছে।

আমাকে মেরো না·····

ডঃ মারকাস বললেন, আমরা তোমার গায়ে হাত দোব না, তোমার নাম কি?

ডেভিস, হেজাব ডেভিস, দয়া করে আমাকে মারবেন না। সে রাস্তার ধারে মৃতদেহগুলো দেখিয়ে বললো, আমি ওদের মতো নই।

না, না, আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

কিন্তু ওদের তো তোমরাই মেরেছ।

না, আমরা নই।

তাহলে ওদের কে মেরেছে?

ওদের মরার সঙ্গে আমাদের কিছু·····

তোমরা আমাকে মিথ্যা কথা বলছ, তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ নও, তোমরা মানুষ সেজেছ, আমি অসুস্থ, রক্তপাত হচ্ছে, আমি আমি ··।

লোকটি ব্যথায় কাতর হয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের পেট টিপে ধরল।

কি হলো ?

লোকটি মাটিতে পড়ে গেল, জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল, মুখ সাদা হয়ে গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

আমার পেট, ওরে বাবা আমার পেট, হেজার ডেভিস হাঁপাতে লাগল। তারপরই সে খানিকটা রক্ত বমি করলো। কোনো ভুল নেই। পরিষ্কার তাজা, লাল রক্ত।

মিঃ ডেভিস ?

কোনো সাড়া নেই। ডেভিস নীরব, নিস্পন্দ, চোখ মুদ্রিত। নিশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কাছে এসে ওরা দেখল খুব আস্তে বুক ওঠা-নামা করছে। তাহলে এখনও বেঁচে আছে।

গ্যারি বললো, ছবিতে আমরা বোধহয় এই লোকটাকেই দেখেছি। লোকটা তো বেঁচে আছে দেখছি। আশ্চর্য !

দু'জনে স্থির করল যে করে হোক হেজার ডেভিসকে তুলে নিয়ে যেতেই হবে। এই বিপর্যয়ের সে একমাত্র সাক্ষী।

হেজার ডেভিস অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাই তাকে হেলিকপটারে তুলতে বেশি বেগ পেতে হয় নি নইলে লোকটা যে পরিমাণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তাতে তাকে সজ্ঞানে তুলতে হলে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হতো, তাতে হয় সে আরও দুর্বল হয়ে পড়তো কিংবা হয়তো মারাই যেত।

এক হাতে বাচ্চা ও এক হাতে মই ধরে হেলিকপটারে উঠতে গ্যারির বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। ক্যাপসুল তুলতে অসুবিধে হয় নি। হেলিকপটার থেকে একটা কপিকল নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারই সাহায্যে ওটা সহজেই তুলে নেওয়া গিয়েছিল।

হেলিকপটারে উঠেও ওরা ওদের বেলুন স্যুট চুপসে দিলো না কারণ

সঙ্গে ক্যাপস্যুল রয়েছে। যদিও ক্যাপস্যুলটি প্লাস্টিকের খাপে পুরে সেটি সীল করে দেওয়া হয়েছিল তথাপি সতর্ক থাকা উচিত কারণ তার চরিত্র এখনও জানা যায় নি। আপাততঃ ওরা কিছু অকসিজেন নিয়ে নিল যাতে আরও দু' ঘণ্টা ওরা বেলুন স্যুট পরে থাকতে পারে।

হেলিকপটার থেকে ওরা রেডিও মারফত আর্থার ওয়ালেসেব সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

আর্থার ওয়ালেস জিজ্ঞাসা করলো, কি পেলে হে? ক্যাপস্যুল পেয়েছ? কি দেখলে?

মেলোটাউন ইজ ডেড, সব লোক মরেছে। আমরা এমন কিছু পেয়েছি যাতে আমরা হয়তো কিছু জানতে পারব; ডঃ মারকাস বললেন।

সাবধান, রেডিওতে কথা বলছ, যে কেউ আমাদেব কথা শুনতে পাবে, এটা ওপেন সার্কিট।

আমি তা জানি। তুমি সেভেন স্ট্রোক টুয়েলভ-এব অর্ডার দিতে পারবে।

চেষ্টা করছি, এখনি চাও?

হ্যাঁ, এখনি।

ফেদারটাচ-এ?

হ্যাঁ।

ক্যাপস্যুল পেয়েছ?

পেয়েছি।

ঠিক আছে, আমি অর্ডার দিচ্ছি।

সেভেন স্ট্রোক টুয়েলভ (৭/১২) ব্যাপারটা কি? অতি দ্রুত বায়োলজিক্যাল পরীক্ষার জরুবী প্রয়োজন হলে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা কবার যে আয়োজন তারই কোড নম্বর হলো ৭/১২।

ডঃ মারকাস আশংকা কবছেন যে ক্যাপস্যুলে এমন সাংঘাতিক কোনো জীবাণু আছে, যা প্লেগ জীবাণুর চেয়েও মারাত্মক, সেইরকম কোনো জীবাণুর অতর্কিত আক্রমণে মেলোটাউনের সকলে মরেছে। ফেদারটাচের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস আকাশবাহিত জীবাণুদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল

করতে হলে পারমাণবিক থার্মো-নিউক্লিয়ার রশ্মি প্রয়োগ করতে হবে। এই থার্মো-নিউক্লিয়ার রশ্মি প্রয়োগ করার জন্যে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ঠিক করতে বেশ কিছু সময় লাগে।

ডঃ মারকাস ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা আগে অবশ্য ক্যাপসুলটি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করবেন এবং সত্যই ওর ভেতরে কোথাও কোনো জীবাণু আছে কিনা তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন। যদি কোনো জীবাণু পাওয়া যায় তাহলে তার চরিত্র জানতে হবে কিন্তু যদি দেখা যায় যে সে জীবাণু সত্যই অতি সাংঘাতিক তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করতেই হবে। এজন্য থার্মো-নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রয়োগ করতেই হবে।

একটা জাতীয় ল্যাবরেটরি তা সে যত বড় ও জাতির স্বার্থে যত জরুরী হোক না কেন, সেখানে কোনো রকম থার্মো-নিউক্লিয়ার ব্যবস্থা রাখার বিরোধী ছিল অ্যামেরিকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছিলেন এবং ডঃ মারকাস প্রমুখ বিজ্ঞানী-দের যুক্তি মেনে নিয়ে তিনি ৭/১২ নম্বর নির্দেশ জারী করে ফেদারটাচ ল্যাবরেটরিকে থার্মো-নিউক্লিয়ার ব্যবস্থা রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন তবে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনকে খুশি করার জন্যে ফেদারটাচকে বললেন যে উক্ত পারমাণবিক রশ্মি প্রয়োগ করার আগে তাঁকে যেন শুধু একটু জানিয়ে দেওয়া হয়। টেলিফোনে জানালেও চলবে।

ক্যালিফোরনিয়ার এয়ারফোর্স বেস থেকে একটা দ্রুতগামী ফাইটার প্লেনে পাইলট, রেডিও অপারেটর ও তাদের সহকারী ব্যতীত মাত্র দু'-জন যাত্রী।

একজন হলো উইলিয়ম ইয়ং এবং অপরজন স্যাম চেসার। এদের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। চেসার চুপচাপ বসে আছে কিন্তু উইলিয়ম ইয়ং সাইক্লোস্টাইল করা একখানি বই পড়ছে। সেই বইয়ের মলাটে বেশ মোটা অক্ষরে লেখা আছে :

টপ সিক্রেট

কেবল মাত্র অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই বই পড়তে পারবে। অপর কেউ এই বই পড়লে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

নেভাডা স্টেটে যে প্রজেক্ট ফেদারটাচ-এর ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে এই বইখানিতে তারই সম্পূর্ণ বিবরণী দেওয়া আছে। ল্যাবরেটরির ইতিহাস, উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিভাগ, সাজ-সরঞ্জাম, লাইব্রেরি, বাড়ির নকশা ইত্যাদি সব কিছু এই বইতে লেখা আছে এমন কি ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করবে তাদের আচরণবিধি ও আহারের ব্যবস্থা ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে।

পুরো ল্যাবরেটার বাড়িটাই নিচে। মোট পাঁচটি তল আছে তার মধ্যে চারটি তল ল্যাবরেটরি, পঞ্চম তলটি অবিজ্ঞানী কর্মীদের ব্যবহারের জন্যে। এক-একটি তল লেভেল-১, লেভেল-২ ইত্যাদি, এইভাবে চিহ্নিত।

মাটির নিচে এমন যে একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে গোপন রাখার জন্যেই বইয়ের মলাটে উক্ত শাস্তির কথা লেখা আছে। যদি কেউ ভুল করেও অথবা নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ঐ বই পড়ে থাকে তবে তাকে কুড়ি বছর জেল দেওয়া হবে এবং কুড়ি হাজার ডলার জরিমানা দিতে হবে।

ডঃ ইয়ং এই বইখানি আগেও পড়েছে তবুও আবার পড়লো। কারণ প্রথমবারে যে বইখানি পড়েছিল তারপরে সংশোধন করে এই বই ছাপা হয়েছে। কিছু নতুন তথ্য যুক্ত হয়েছে। নতুন সংস্করণ পড়ে ডঃ ইয়ং জানতে পারলো যে লেভেল-১ অর্থাৎ সর্বোচ্চ তলে একটি বিরাট ও সর্বাধুনিক কমপিউটার বসানো হয়েছে। কমপিউটার তো আগেই বসানো হয়েছে তথাপি কোনো কারণে পূর্ব সংস্করণে কেন উল্লেখ করা হয় নি তা ডঃ ইয়ং জানে না। আরও একটি তথ্য জানা গেল যে প্রজেক্ট ফেদরটাচ-এর এই বিস্ময়কর ল্যাবরেটরির একটি নতুন নাম দেওয়া

হয়েছে, এডিসন ইনস্টিটিউট। যাঁর নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে আমেরিকা সমৃদ্ধশালী হয়েছিল সেই অবিস্মরণীয় ব্যক্তি টমাস আলভা এডিসনের নামে ইনস্টিটিউটের নামকরণ করা হয়েছে।

একটি পৃষ্ঠার দিকে ইয়ং-এর দৃষ্টি যখন আবদ্ধ তখন অ্যামপ্লিফায়ার মারফত পাইলট ডাকলো :

ডঃ ইয়ং ?

হ্যাঁ, কি বলছো ?

আমরা চার মিনিটের মধ্যেই টাচডাউন করবো অর্থাৎ নামব।

ঠিক আছে কিন্তু আমরা কোথায় নামব পাইলট ?

ফ্ল্যাটরক এয়ারস্ট্রিপ, নেভাডা।

বেশ, ডঃ ইয়ং উত্তর দিলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন ল্যাণ্ড করলো।

এডিসন ইনস্টিটিউট স্থাপন করার পক্ষে নেভাডা আদর্শ জায়গা। নেভাডা স্টেটের ডাক নাম সিলভার স্টেট। অ্যামেরিকার পঞ্চাশটি রাজ্যের মধ্যে নেভাডা আকারে সপ্তম কিন্তু জনসংখ্যায় উনপঞ্চাশতম। এর নিচে নাম হলো আলাস্কার। নেভাডার চুয়াল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা পঁচাশি জন বাস করে তিনটি শহরে, ল্যাস ভেগাস, রেনো এবং কারসন সিটিতে। অন্যত্র জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১·২ ভাগ।

ভি এল আর টেলিস্কোপ ব্যতীত নেভাডায় আছে মার্টিনডেলে আলট্রা-এনার্জি টেস্ট স্টেশন, লস গ্যাডসের কাছে এয়ারফোর্স মেডিভেটর ইউনিট, ভিণ্টন ফ্ল্যাটস-এ বিখ্যাত অ্যাটমিক সাইট। এই সবগুলি ঐ স্টেটের দক্ষিণ ত্রিকোণে অবস্থিত। হালে উত্তর-পশ্চিম অংশের নির্জন অংশে পেণ্টাগনের উদ্যোগে আরও কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তবে সেগুলি কি বা তাদের উদ্দেশ্য কি তা জানা যায় নি।

এই অঞ্চলে দিনের মধ্যে তাপ যখন সর্বোচ্চ, রীতিমতো গরম তখন ইয়ং ও স্যাম চেসার প্লেন থেকে নামল। সূর্যকে ঢাকবার জন্যে আকাশে এক টুকরোও মেঘ নেই। এয়ারস্ট্রিপের পিচ বেশ নরম হয়েছে তাপের

ফলে।

রানওয়ে থেকে কিছু দূরে কয়েকটা কাঠের ঘর। এই ঘরগুলোকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওরা দু'জনে সেইদিকে চললো। চেসার বললো, বিল তুমি এগোও, আমি আসছি।

ডঃ ইয়ং একটা ঘরে ঢুকে দেখল দু'জন পাইলট দুটো চেয়ারে বসে পোকার খেলতে খেলতে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে। একজন গার্ড কাকে টেলিফোন করছে, তার কাঁধ থেকে একটা মেসিনগান ঝুলছে। ডঃ ইয়ং ঘরে ঢুকল কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করলো না।

টেলিফোনের কাছে একটা কফি মেসিন দেখতে পেয়ে ডঃ ইয়ং এক মগ কফি নিয়ে চুমুক দিতে দিতে একজন পাইলটকে জিজ্ঞাসা করলো, শহরটা কোথায় ? কোন্‌দিকে ?

জানি না।

কেন ? তোমরা কি এদিকে যাওয়া আসা করো না ?

না স্যার, ফ্ল্যাটরক আমাদের কোনো রুটে পড়ে না।

তাহলে এই এয়ারফিল্ডটা আছে কোন্ কম্মে ?

ঠিক সেই সময়ে স্যাম চেসার ঘরে ঢুকে ডঃ ইয়ংকে বললো, চল হে, ও কফি খাচ্ছ ? তাহলে শেষ করে নাও।

গরম থেকে ঠাণ্ডায় এসে এত শীঘ্র আবার গরমে যেতে মন না সরলেও যেতেই হবে।

স্যাম চেসার অন্য একটা পথ দিয়ে বেরোল, পিছনে বিল ইয়ং।

বাইরে বেরোতেই গরম হাওয়ার ধাক্কা। ধাক্কা সামলে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সামনে হালকা নীল রঙের একটা সিডান গাড়ি। ইয়ং প্রথমেই যা লক্ষ্য করল তা হলো এই যে গাড়িতে কোনো নম্বর নেই বা গাড়ির মালিক কে বা কারা তাও লেখা নেই।

স্যাম চেসার আগে গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে অপর দিকের দরজা খুলে দিয়ে বিলকে গাড়িতে উঠতে বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়িতে উঠে বিল জিজ্ঞাসা করলো।

স্যাম তোমার ড্রাইভার কোথায় গেল ? এই গাড়ি কে নিয়ে এল ?

স্যাম বললো, গাড়ি কেউ না কেউ রেখে গেছে। এখানে ড্রাইভার রাখা হয় না, যত সম্ভব কম ও অতি বিশ্বাসী লোক দ্বারা কাজ চালানো হয়।

মতলব ?

মতলব আর কিছু নয়, লোক যত কম থাকে কথা চালাচালি হওয়ার সম্ভাবনাও তত কম।

নির্জন পাহাড়ী উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো রাস্তা দিয়ে ওরা চললো। গরম হাওয়া বইছে। দূরে নীল পাহাড়গুলো যেন গরম বাতাসের ধাক্কায় কাঁপছে। গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই তবে মরুভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে জায়গায় জায়গায় তাপসহ এক ধরনের গুল্ম লাগানো হচ্ছে। সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

রাস্তাটা খুব ভালো। ঘরের মেঝের মতো মসৃণ তবে ধুলো বালি প্রচুর। তা তো থাকবেই। রাস্তা একেবারে অক্ষত মনে হয়, এখান দিয়ে বুঝি গাড়ি যায় না। ওয়াশিংটনেও এত ভালো রাস্তা নেই।

কৌতূহলী ইয়ং জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার হে? ও রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায় না বুঝি ?

যায় না মানে ? প্রচুর গাড়ি গেছে, ভারি লরি ও অনেক ট্র্যাকটরও গেছে। রাস্তাটা খুব মজবুত করেই তৈরি করা হয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে যে ভারি গাড়ি যায় নি বা যায় না তা আমরা জানতে দিতে চাই না। এইটুকু রাস্তা তৈরি করতে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করা হয়েছে, হয়তো আরও বেশি।

হ্যাঁ আমিও বইখানায় সেইরকম পড়ছিলুম, প্রতি পদে যতদূর সম্ভব সাবধানতা নেওয়া হয়েছে।

স্যাম চেসার বললো, এ তো কি ? অ্যামেরিকান এঞ্জিনিয়াররা পারে না কি ? জান ? ওয়েস্ট বার্লিনে ইস্ট বার্লিনের বর্ডারে একটা এক মাইল লম্বা টানেল খোঁড়া হয়েছিল কিন্তু অত বড় একটা টানেল খোঁড়া হলো অথচ অত মাটি যে কোথায় পাচার করা হলো তা রাশিয়ানরা টের পেল না। তারপর সি আই ও সেই টানেলে আড়িপাতা যন্ত্রপাতি

বসালো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছিল। পরে রাশিয়ানরা দর্শনীয় হিসেবে সেই টানেল দর্শকদের দেখাতো।

আচ্ছা স্যাম শুনেছি আমাদের এই ল্যাবরেটরির ভেতরে নাকি এমন একটা পারমাণবিক যন্ত্র বসানো আছে যাতে সমস্ত বাড়িটাই মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া যায় অথচ বইখানাতে তার উল্লেখ দেখলুম না।

হ্যাঁ আছে তো? তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি যে বইখানায় ৪৯ আর ৫০ পৃষ্ঠা নেই, ঐ দুটো পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ ছিল কিন্তু পৃষ্ঠা দুটো বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাকা রাস্তা শেষ হলো। গাড়ি এবার একটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল। ডঃ ইয়ং একটা সিগারেট ধরাল।

স্যাম বললো, এইটেই কিন্তু তোমার শেষ সিগারেট।

জানি, সেইজন্যেই তো আস্তে আস্তে সুখটান দিচ্ছি।

রাস্তার ডান দিকে মস্ত বড় একটা সাইনবোর্ড: "সরকারী সম্পত্তি, অনধিকার প্রবেশ নিষেধ" তবে কোনো রক্ষী নেই, পাহারাদার কুকুরও নেই।

এই রাস্তা ধরে ওরা মাইলখানেক চললো তারপর গাড়ি একটা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। খানিকটা ওঠবার পব কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা গোল একটা জায়গা ডঃ ইয়ং-এর নজরে পড়ল। বেশ বড় জায়গা, তার ব্যাস একশ মিটারের বেশি হবে। বেড়া বেশ উঁচু, দশ ফুট হবে, খুব মজবুত। মাথার দিক বাইরের দিকে বাঁকানো।

বেড়ার ভেতরে একটা কাঠের বাড়ি দেখা গেল আর দেখা গেল ভুট্টার ক্ষেত।

এখানে খানিকটা ভুট্টার ক্ষেত কেন? ডঃ ইয়ং জিজ্ঞাসা করল।

আছে, আছে, মজা আছে, পরে বুঝবে, হাসতে হাসতে স্যাম চেসার বললো।

ঘেরা জায়গার গেটের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। টেকসান্ প্যাণ্ট আর চেক শার্ট পরা লম্বা একটা ছোকরা গেট খুলে দিল। বাঁ হাতে একটা মোটা স্যাণ্ডউইচ, লাঞ্চ করছিল, ডান হাত দিয়ে গেট খুললো।

স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে আবার গেট বন্ধ করে দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

গেটের মাথায় একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা আছে, সরকারী সম্পত্তি। মার্কিন সরকারের কৃষি বিভাগ। মরুভূমি পুনরুদ্ধার পরীক্ষা কেন্দ্র।

স্যাম চেসার গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। গাড়ি দাঁড় করালো সেই কাঠের বাড়ির সামনে। গাড়ির চাবি ড্যাশবোর্ডে ঝুলতে লাগলো, ওরা সেই কাঠের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। বাড়ির ভেতরে প্রথমেই একটা ছোট ঘর। নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে একটি ছোকরা বসে, এরও পরণে টেকসান প্যান্ট, মাথায় কাউবয় টুপি, গায়ে চেকশার্ট, আবার গলায় একটা টাই আছে। এ ছোকরাও স্যাণ্ডউইচ চিবোচ্ছিল। সে কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। এমনভাবে হাসল যেন আগন্তুক দু'জন ওর ইয়ার। অবশ্য বিজ্ঞানীরাও যতদূর সম্ভব স্বরূপ গোপন রাখেন।

চল বিল ভেতরে চল, স্যাম চেসার বললো।

ভেতরেই তো এসেছি।

আরে এসই না, স্যাম চেসার ওর হাত ধরে টানল।

সেই ছোকরা স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করলো, কিছু কাজ আছে বুঝি, আমাকে কোনো দরকার আছে?

না, তুমি লাঞ্চ কর, আমার বন্ধু একটু বেড়াতে এসেছে, স্যাম চেসার বললো, আমরা রোম যাব।

তাই বুঝি, কটা বাজল?

আমার ঘড়ি বন্ধ, যা গরম পড়েছে।

এই কথাবার্তার মধ্যে বুঝি কিছু সাংকেতিক ভাষা লুকনো আছে। ছোকরা আর কিছু বললো না, নিজের চেয়ারে বসে স্যাণ্ডউইচ চিবোতে লাগলো। তিন পুরু বেশ বড় আর গোল স্যাণ্ডউইচ এক খাঁজে ভেজি-টেবল, পরের খাঁজে মিট, তার সঙ্গে কিছু মসলা।

বিল এবং স্যাম সেই ছোট ঘর থেকে আর একটা ঘর পার হয়ে একটা লম্বা ঘরে ঢুকলো। লম্বা ঘর অপেক্ষা করিডর বলাই ভালো। করিডরের

দু'ধারে পর পর দরজা। দরজার মাথায় ছোট ছোট লেবেল। কোনোটায় লেখা বীজ ঘর, কোনো ঘরটার মাথায় লেখা মাটি পরীক্ষা কীটনাশক ইত্যাদি।

প্রতি ঘরেই লোকজন কাজ করছে, সকলেই ব্যস্ত। স্যাম বললো, এটা কিন্তু সত্যিই একটা কৃষিক্ষেত্র তবে পরীক্ষামূলক। চেষ্টা করা হচ্ছে এই মরু অঞ্চলে ভুট্টা ফলানো যায় কি না। তা একটা ভুট্টার ক্ষেত তো দেখলে। এই বছরেই প্রথম চাষ করা হয়েছে, মনে হচ্ছে ভালো ফসল পাওয়া যাবে। এখানকার কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভুট্টার এমন বীজ তৈরি করতে পেরেছে যার জন্যে সেচের জল অল্প লাগবে এবং জমিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকলেও গাছ হবে। তা দেখা যাক ফসল কি পরিমাণ পাওয়া যায়।

ডঃ ইয়ং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার ফেদারটাচ ল্যাবরেটরি কোথায়?

অত ব্যস্ত কেন? এই তো এসে পড়েছি, স্যাম বললো।

এসে পড়েছি? এ ঘরটা তো দেখছি কৃষিযন্ত্রে ভর্তি, বাইরেও তো দেখলুম দরজার মাথায় লেখা রয়েছে স্টোরেজ'।

ডঃ ইয়ং-এর কথা শেষ হতে না হতেই ঘরখানা নামতে আরম্ভ করলো, কৃষি-যন্ত্রপাতি সমেত, লিফটের মতো। পঞ্চাশ সেকেণ্ড পরে ঘর থামল এবং সামনের দেওয়াল দু'ভাগ হয়ে দু'পাশে সরে গেল।

বেরিয়ে এস, ডঃ ইয়ংকে স্যাম চেসার বললো।

স্টোরেজ ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এল, স্টোরেজ ঘরটাও ওপরে উঠে গেল। ওরা নামল সুন্দর ঝকঝকে একটা ঘরে। অদৃশ্য ফ্লোরেসেণ্ট আলো জ্বলছে। ঘরে কোনো ফারনিচার নেই। দেওয়ালের রং লাল। ঘরে আসবাব বলতে কোমর পর্যন্ত উঁচু চৌকো একটা বাক্স যেটা লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় অনেকটা কম। মাথায় সবুজ কাঁচ বসানো আছে অথবা ভেতরে সবুজ আলো জ্বলছে।

স্যাম চেসার বললো, ঐ বাক্সর মতো যন্ত্রটা হলো অ্যানালাইজার, বিল তুমি তোমার দু'হাতের চেটো বেশ ভালো করে ঐ কাঁচের ওপর রাখ।

তাতে কি হবে?

আরে রাখই না, তুমি ক্রমশঃ সব জানতে পারবে, নাও হাত রাখ।
ডঃ ইয়ং সেই বাক্সর কাঁচের ওপর দুই হাত রাখলো। দুই হাতে কে যেন আস্তে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। একটু পরে পিঁ করে শব্দ শোনা গেল। ঠিক আছে বিল, এবার হাত তুলে নিয়ে পেছিয়ে এস।
ডঃ ইয়ং হাত উঠিয়ে পেছিয়ে আসার পর স্যাম চেসার নিজের হাত রাখলো। পিঁ করে আওয়াজ হতে সেও হাত উঠিয়ে নিল।
চল বিল, তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে না এডিসন ইনস্টিটিউটের সিকিউরিটি ব্যবস্থা কেমন? চল দেখবে চল। মূল ল্যাবরেটরির ভেতরে ঢোকবার আগেই তুমি টের পাবে, এই ঘরটায় ঢোকো।
ডঃ ইয়ং জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ঐ অ্যানালাইজারটা কি? যার ওপর আমরা হাত রাখলুম?
ওটা একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ওতে আমাদের সবকটা আঙুলের আর হাতের চেটোর পুরো ও পরিষ্কার ছাপ উঠে গেছে। এডিসন ইনস্টিটিউ-টের সমস্ত কর্মীর হাতের ছাপ জমা আছে। মুহূর্তে সেই ছাপের ফটো-প্রিন্ট বার করা যায়।
স্যামের নির্দেশমতো সেই ঘরে ঢুকে ডঃ ইয়ং একটা দরজা দেখলো যার মাথায় লেখা রয়েছে "সিকিউরিটি"। সেই দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজার সামনে দু'টো পাল্লা আপনা-আপনি দু'পাশে নিঃশব্দে সরে গেল। সেই ঘরে একজন মাত্র লোক একটা নীরব যন্ত্রের সামনে বসে আছে। অনেকগুলো সবুজ ডায়াল, সেদিকে সে নজর রাখছে।
স্যাম তাকে বললো, হ্যালো সিলভিও, কেমন আছ?
ভালো আছি ডঃ চেসার, আপনারা আসছেন আমি দেখেছি।
উইলিয়ম ইয়ং-এর সঙ্গে স্যাম চেসার পরিচয় করিয়ে দিল কিন্তু বিজ্ঞানী হয়েও ডঃ ইয়ং বুঝতে পারল না সিলভিও একটা বদ্ধ ঘরে বসে থেকে তাদের আগেই দেখতে পেল কি করে?
ডঃ ইয়ং এর অবাক হওয়ার কারণ বুঝতে পেরে সিলভিও তাকে যন্ত্রের কাছে ডেকে এনে সব দেখিয়ে দিয়ে বললো বাইরে পাহাড়ের আড়ালে চারদিকে স্বয়ংক্রিয় টিভি ক্যামেরা ও র‍্যাডার স্ক্যানার লুকনো আছে

আর এখানে এই দেখুন টিভি ও র‍্যাডার স্ক্রীন রয়েছে। দিন বা রাত্রে একশ কিলোগ্রাম ওজনের বেশি কোনো প্রাণী ওদিকে এলে আমরা জানতে পারি। আজ পর্যন্ত এই যন্ত্র আমাদের ঠকায় নি।

বিল তুমি তো একটা সিকিউরিটি ব্যবস্থা দেখলে, আর একটা দেখাই চল।

ওরা পাশেই একটা ঘরে ঢুকলো। ঘরে ন'টা বড় বড় খাঁচা রয়েছে। বিল নাক কুঞ্চিত করলো। একটা চেনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ন'টা খাঁচায় ন'টা জার্মান শেফার্ড কুকুর রয়েছে, বেশ বড় বড়।

কুকুরগুলো ওকে দেখে ডাকতে আরম্ভ করলো কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না কেন? মুখ খুলছে, হাঁ করছে, খাঁচার সামনে এগিয়ে আসছে কিন্তু কুকুরগুলো নির্বাক কেন? এ আবার কি ম্যাজিক?

স্যাম বললো, এগুলো হলো মিলিটারি ট্রেনিং প্রাপ্ত সেন্ট্রি ডগ, এদের হিংস্র করা হয়েছে। পুরু চামড়ার পোশাক আর পুরু চামড়ার গ্লাভস পরে তবে এদের রক্ষী এদের খাঁচায় ঢোকে। রক্ষীকেই যদি এত সাবধান হতে হয়, যে ওদের কাছে যায়, চেনাশোনা আছে। খাবার দেয়, তাকেই যদি এত সাবধান হতে হয় তাহলে অন্য লোকের কি অবস্থা হতে পারে ভেবে দেখ।

ওদের কি জিভ···নানা জিভ তো রয়েছে, তবে?

কুকুরগুলোর ল্যারিংসে একটা অপারেশন করা হয়েছে তাই শব্দ বেরোচ্ছে না, স্যাম বললো।

ও! ল্যারেঞ্জেকটমি।

হ্যাঁ।

তুমি কি কখনও ওদের পাল্লায় পড়েছ? বিল জিজ্ঞাসা করলো।

সে দুর্ভাগ্য যেন না হয়, হাসতে হাসতে স্যাম বললো।

ডঃ ইয়ংকে স্যাম একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল। ঘরটার দেওয়াল ভর্তি লকার। একটা লকারে ডঃ উইলিয়ম (বিল) ইয়ং নাম লেখা রয়েছে। ডঃ ইয়ং এদের ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট। আগে থেকেই তার জন্যে লকার ঠিক করে রাখা হয়েছে দেখে।

স্যাম চেসার বললো, ওহে এবার তোমার যাবতীয় পোশাক ছেড়ে ফেলে ঐ যে সব গোলাপী রঙের ইউনিফর্ম রয়েছে তার মধ্যে যেটা তোমাকে ফিট করবে সেইটে পর।

ডঃ ইয়ং নিজের পোশাক ছেড়ে গোলাপী একটা ইউনিফর্ম পরলো। একটু ঢিলে, তা হোক।

চল এবার আর এক ঘরে।

সেখানে কি ন্যাড়া হতে হবে নাকি?

প্রায় একরকম তাই, চল।

ওরা দু'জনে একটা প্যাসেজ দিয়ে চললো। সামনে একটা গেট। ওরা যেই সেই গেটের সামনে এসেছে অমনি কোথায় যেন একটা মৃদু সাইরেন বেজে উঠলো আর গেটটাও বন্ধ হয়ে গেল। গেটের মাথায় একটা সাদা আলো জ্বলে উঠলো। ডঃ ইয়ং ঘাবড়ে গেলেন।

স্যাম চেসার তো সব জানে, সে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ হে তুমি যা পরে এসেছিলে সব ছেড়ে রেখেছ তো? নাকি ভেতরে কিছু আছে?

হ্যাঁ, সবই তো ছেড়ে রেখে এসেছি।

আঙুলের আংটি, ঘড়ি বা অন্য কিছু?

ঘড়ি তো খুলি নি।

ঐ হয়েছে, যাও ঘড়িটা খুলে লকারে রেখে এস।

ডঃ ইয়ং ঘড়ি খুলে রেখে এসে সেই গেটের সামনে দাঁড়াতেই সেই গেট খুলে গেল।

এখানে সবই কি অটোম্যাটিক ব্যবস্থা নাকি হে? ডঃ ইয়ং প্রশ্ন করেন।

তুমি যেন কিছু জান না, প্ল্যান করার সময় তুমিও তো ছিলে।

তা তো ছিলুম, সে তো আমার নিজস্ব ল্যাবরেটরির চাহিদার কথা লিখে দিয়েছিলুম তারপর যে এমন অটোম্যাটিক ব্যবস্থা করা হবে তা আমি জানব কি করে? যা ভালই হয়েছে।

হ্যাঁ, সব অটোম্যাটিক, সঙ্গে ঘড়ি, আংটি, চশমা বা কণ্ট্যাক্ট লেনস, পেসমেকার, বাঁধানো দাঁত এসব থাকলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

সামনে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে: তোমরা এক নম্বর

লেভেলে প্রবেশ করছো। সোজা বিশোধন নিয়ন্ত্রণে চলে যাও।

এক নম্বর লেভেলের সব দেওয়াল লাল। বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন রং। দু'নম্বর লেভেল হলদে, তিন নম্বর সাদা, চার নম্বর সবুজ আর পাঁচ নম্বব নীল। মন বা কাজ করার প্রকৃতির ওপর রঙের একটা প্রভাব আছে, সেইজন্যে গবেষণার বিষয় অনুসারে বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন রং করা হয়েছে।

বিশোধন নিয়ন্ত্রণ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতে দরজার দুটো পাল্লা দু'দিকে সরে গেল। ঘরের ভেতরে তিনটে কাঁচের বুথ।

স্যাম চেসার বললো, যে-কোনো একটা বুথে ঢুকে বসে থাক।

বসে থাকব ?

হ্যাঁ, বসে থাকবে, দেখই না কি মজাটাই না হবে।

ডঃ ইয়ং একটা বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। বুথের ভেতরে একটা কৌচ, কৌচের সামনে একটা টেলিভিসন পর্দা এবং কতরকম সব যন্ত্র-পাতি। যন্ত্রগুলোব কোনো কোনোটায় ক্ষুদে ক্ষুদে আলো জ্বলছে।

একটা যান্ত্রিক স্বর বললো, সিট ডাউন, সিট ডাউন, সিট ডাউন।

ডঃ ইয়ং কৌচে বসে পড়লো।

যান্ত্রিক কণ্ঠ : কৌচে বেশ এঁটেসেঁটে বসো, সামনে টেলিভিসন পর্দায় নজর রাখ।

ডঃ ইয়ং ভাল করে বসবার আগে দেখলো পর্দায় অনেক বিন্দু রয়েছে, সেগুলো যোগ করলে একটা মানুষের আকৃতি হবে কিন্তু এঁটে সেঁটে ভাল করে ঠেস দিয়ে বসার পর বিন্দুগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে আবার একে একে ফুটে উঠলো। বিন্দুগুলো স্থান পরিবর্তন করেছে কি না ডঃ ইয়ং বুঝতে পারল না। কিন্তু ডঃ ইয়ং চেয়ারে সরে বসতেই বিন্দুগুলো মিলিয়ে গেল।

যান্ত্রিক কণ্ঠ : ভেরি গুড, এবার কাজ আরম্ভ করা যাক। নাম বলো, শেষ নাম আগে, প্রথম নাম পরে।

উইলিয়ম ইয়ং।

শেষ নাম আগে, প্রথম নাম পরে।

ইয়ং, উইলিয়ম।

থ্যাংক ইউ, এবার বল, ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ হ্যাভ ইউ এনি উল ?

ইয়ার্কি করছো ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। যন্ত্রে কি সব হিস হিস হুস হাস আওয়াজ হলো, তারপর পর্দায় লেখা ফুটে উঠলো।

ব্যক্তির এই উত্তর রেকর্ড করা যাচ্ছে না।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, ছড়াটি দয়া করে বলুন।

ডঃ ইয়ং নিজেকে বোকা মনে করলেন তারপর আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন, ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ হ্যাভ ইউ এনি উল ? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস ফুল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ তারপর যান্ত্রিক কণ্ঠ বললো থ্যাংক ইউ। পর্দায় লেখা ফুটে উঠলো।

ব্যক্তি নিজের নাম বলেছে ইয়ং, উইলিয়ম।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর : ভালো করে শোনো, যা প্রশ্ন করবো এক কথায় তার উত্তর দেবে, হ্যাঁ কি না, আর কিছু বলবে না। গত বারো মাসের মধ্যে বসন্তর টিকে নিয়েছ ?

হ্যাঁ।

ডিফথেরিয়া ?

হ্যাঁ।

টাইফয়েড এবং এ এবং বি প্যারাটাইফয়েড ?

হ্যাঁ।

টিটেনাস টকসয়েড ?

হ্যাঁ।

ইয়োলো ফিভার ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব হয়েছে।

ডঃ ইয়ং-এর বিরক্ত হওয়ার কারণ আছে। প্রজেক্ট ফেদারটাচে যোগ দেবার সময় যত রকম সম্ভব সব রকম টিকে ও ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল এমন কি প্লেগ, কলেরাও বাদ যায় নি এবং ছ'মাস অন্তর এগুলি

রিপিট করা হতো। যাতে ভাইরাস ঘটিত রোগ সংক্রমণ না হয় সেজন্যে গামাগ্লবিউলিনও ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর : তোমার কখনও টিউবারকিউলোসিস বা কোনো মাইকো ব্যাকটিরিয়ালঘটিত অসুখ করেছিল ?

না।

কখনও সিফিলিস বা স্পাইরাল ব্যাকটিরিয়াঘটিত ব্যারাম হয়েছিল ? সেরোলজিক্যাল টেস্ট হয়েছে ? কিছু পাওয়া গেছে ?

না।

গত বারো মাসে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটিরিয়াঘটিত যথা, স্ট্রেপটোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস বা নিউমোকক্কাসঘটিত রোগ হয়েছিল ?

না।

গ্রাম নেগেটিভ যথা, গনোকক্কাস, মেনিঙ্গোকক্কাস, প্রোটিয়াস, সিউডো-মোনাস, স্যালমোনেলা বা সিজেলাঘটিত রোগ ?

না।

হালে ফাঙ্গাসজনিত কোনো রোগে ভুগেছ ?

না।

কোথাও ত্বকে কোনো কড়া, খুদে টিউমার বা অনুরূপ কিছু আছে ?

না।

অ্যালার্জি আছে ?

আছে, ফুলের রেণু।

আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর এবার আদেশ করল, প্রাথমিক প্রশ্ন শেষ হয়েছে, এবার তুমি তোমার পোশাক খুলে রেখে কৌচে আগের মতো বেশ এঁটেসেঁটে বসো।

ডঃ ইয়ং আদেশ পালন করলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে যন্ত্রের ভেতর থেকে একটা আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প বেরিয়ে এসে ডঃ ইয়ং-এর দেহের ওপর ঘুরতে লাগল যেন একটা মানুষ আলোটা হাতে ধরে ঘোরাচ্ছে। ডঃ ইয়ং দেখতে পেলেন টিভি পর্দায় ক্রমশঃ অনেক মোটা মোটা বিন্দু ফুটে উঠলো এবং তা একটি পায়ের পাতার আকার নিল।

যান্ত্রিক কণ্ঠ বললো : পায়ে হাজা আছে কি না পরীক্ষা করা হলো।
তারপর আদেশ হলো : উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। ডঃ ইয়ং তাই করলেন।
আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প সারা দেহ পরিক্রমা শেষ করতে আদেশ হলো : এবার চিৎ হয়ে শোও। চিৎ হয়ে শোবার পর আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প কর্তৃক আবার দেহ পরিক্রমা। তাও শেষ হলো।
তোমার স্বাস্থ্য চেকআপ করা হবে, যান্ত্রিক কণ্ঠ আদেশ করলো, শান্ত হয়ে শুয়ে থাক।
যন্ত্রের ভেতর থেকে সাপের মতো কয়েকটা লম্বা যন্ত্র বেরিয়ে এসে কোনোটা মাথা ঘিরে ফেললো, কোনোটা বুকে বসলো, কোনোটা পেটে, কোনোটা বাহুতে। সেই সঙ্গে নানারকম আওয়াজ। ডঃ ইয়ং বুঝলেন ব্রেন, হার্ট, লাংস, নাড়ীর গতি, পাকস্থলী ইত্যাদির স্পন্দন ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার গুলি মাপা হচ্ছে।
এরপর নানারকম আদেশ, বাঁ হাত তোল, ডান হাত তোল, ডান হাত অমুক যন্ত্রের ওপর রাখ, জোরে নিশ্বাস নাও, কাশো, জিভ বার করো। এই ফাঁকে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়ে গেল এবং সেই ইঞ্জেকশন যেখানে বেঁধানো হয়েছিল তার ওপর ছোট একটা পটিও মেরে দেওয়া হলো।
মেডিক্যাল চেকআপ শেষ, যান্ত্রিক কণ্ঠ বললো এবার একটু ডান দিক ঘুরে বসো তোমাকে নিউমেটিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে।
একটা যন্ত্র বেরিয়ে এসে ঘাড়ের নিচে চেপে বসলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডঃ ইয়ং একটা আঘাত অনুভব করলো। হিস্ হিস্ করে একটা শব্দ হলো। জায়গাটায় ডঃ ইয়ং ব্যথা অনুভব করলো।
যান্ত্রিক কণ্ঠ এবার বললো : কয়েক ঘণ্টা তুমি অসুস্থ বোধ করতে পার, মাথা ঝিমঝিম করবে, গা-বমি করতে পারে, বমিও হতে পারে। মাথা ঘুরলে বসে থাকবে। জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে লেভেল কণ্ট্রোলকে জানাবে। তোমার সকল পরীক্ষা শেষ। তোমাকে গামা-জি-এর জন্যে প্রতিষেধক দেওয়া হলো। তোমার পোশাক পরে নাও। সহযোগিতার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। ডান দিকে দরজা।

ঘর থেকে বেরিয়ে ডঃ ইয়ং স্যাম চেসারের সঙ্গে একটা লম্বা লাল করিডর দিয়ে চললেন। হাতে ইঞ্জেকশনের ব্যথা অনুভব করছেন।

যেতে যেতে ডঃ ইয়ং বললো, স্যাম তোমাদের এই মেসিনটার কথা অ্যামেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জানে নাকি হে?

না না, আমরা ওদের বলি নি।

বল নি কেন? ওরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসবে। যন্ত্র যদি রোগ চিনিয়ে দেয়, প্রতিষেধক ব্যবস্থা করে দেয় এমন কি ইঞ্জেকশন দিয়ে পটি পর্যন্ত এঁটে দেয় তাহলে তো ওদের অন্ন মারা যাবে।

স্যাম চেসার বললো, আরও দেখ ব্লাড ইউরিন ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যে পাঁচ জায়গায় ছুটোছুটিও করতে হবে না।

যন্ত্রটির নাম ইলেকট্রনিক বডি অ্যানালাইজার। সরকারী নির্দেশে ১৯৬৫ সালে যন্ত্রটি স্যাণ্ডেমান ইণ্ডাস্ট্রিজ তৈরি করেছে। চাঁদে পাঠাবার জন্যে অ্যাস্ট্রোনট বা মহাকাশচারী তৈরি করা হচ্ছিল। সেই অ্যাস্ট্রোনটদের এই মেসিনে পরীক্ষা করা হতো বা এখনওহয়। সেই সময়ে এক একটি মেসিনের দাম পড়তো সাতাশি হাজার ডলার।

চলতে চলতে ইয়ং লক্ষ্য করলেন, করিডরের দেওয়াল কিছু বাঁকা। ডান দিকটা তো পাহাড়ের নীরেট পাথর, সেটা বাকা তাই অপর দিকের দেওয়াল বাঁকা করতে হয়েছে। সেজন্যে ল্যাবরেটরিগুলি বাঁ দিকেই বসাতে হয়েছিল।

করিডর দিয়ে আরও কর্মী যাওয়া আসা করছিল। সকলের পরণে গোলাপী ইউনিফর্ম। সকলেই গম্ভীর, ব্যস্ত।

আচ্ছা, আমাদের আর সকলে গেল কোথায়? ইয়ং জিজ্ঞাসা করলো।

এইতো এই ঘরে, বলে স্যাম চেসার একটা দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল। দরজার গায়ে লেখা ছিল 'কনফারেন্স—৭'। বেশ বড় ঘর। মাঝখানে মস্ত বড়ো কাঠের টেবিল। প্রজেক্ট ফেদারটাচের বিজ্ঞানীরা সকলেই রয়েছেন। ডঃ নরম্যান মারকাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গ্যারি হাস্টন, যেন ক্লান্ত, বিভ্রান্ত। বিল ইয়ং ও স্যাম চেসার ঘরে সকলেই বসলো। ডঃ মারকাস তাঁর পকেট

থেকে দু'টো চাবি বার করলেন। একটা চাবি রুপোর, অপরটার রং লাল। তাতে একটা চেন লাগান আছে। এই চাবিটা ডঃ ইয়ং ডঃ উইলিয়মকে দিলেন, "চাবিটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে রাখ বিল।"

এটা কিসের চাবি ?

এই সময়ে স্যাম চেসার বললো, ডঃ মারকাস বিল কিন্তু কি-ম্যান সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

কেন সে প্লেনে বইখানা পড়ে নি ?

পড়েছে তবে কি-ম্যান সংক্রান্ত ৪৯ এবং ৫০ পৃষ্ঠা দু'খানা কাটা ছিল, স্যাম চেসার উত্তর দিলো।

ইয়ংকে ডঃ মারকাস তবুও প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কেউ কি-ম্যান সম্বন্ধে কিছু বলে নি বা তোমার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে যে আমাদের টিমে নেওয়া হয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ যে তুমি অবিবাহিত।

না ডঃ মারকাস, এসব কথা আমি এই প্রথম শুনছি, বলে বিল ইয়ং চাবিটা গলায় পরে নাড়তে লাগল।

ডঃ মারকাস বললেন, যে দুটো পৃষ্ঠা টপ সিক্রেট তা বই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা ছিল যে আমাদের এই এডিসন ইনস্টিটিউট জরুরী কারণে ধ্বংস করে দেবার জন্যে এই বাড়ির মধ্যে একটি পারমাণবিক অস্ত্র বসানো আছে যেটি একটি ছোটখাটো অ্যাটম বোমা, তবে এই বাড়িটি ও যে পাহাড়ের মধ্যে এই বাড়ি সেই পাহাড় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমাকে অবশ্যই সেই ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠা পড়তে দেওয়া হবে কিন্তু ধরা যাক সেরকম একটা জরুরী অবস্থা এলো। সে অবস্থা কখন আসবে ? একেবারে শেষ মুহূর্তে। দ্রুত স্থির করা হলো যে ইনস্টিটিউট উড়িয়ে দেওয়া হবে। উড়িয়ে দিতে হলে অ্যাটম বোমাটি ফাটাতে হবে। কে সেই অ্যাটম বোমা ফাটাবে ? এখানে বলে রাখা ভালো যে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমরা সকলেই ধ্বংস হব। বিল তুমি রাজি আছ তো ? কারণ তোমাকেই কি-ম্যান নির্বাচন করা হয়েছে।

মরতে তো রাজি আছি এবং আমাকে সেরকম প্রশ্নও আগে করা হয়েছিল। তখন আমি আশংকা করেছিলুম জীবাণুর আক্রমণে মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, যাই হোক আমি মৃত্যুর জন্যে সর্বদা প্রস্তুত এবং বেশ কয়েকবার মৃত্যুর মুখোমুখিও হয়েছি। তাহলে এবার কি-ম্যানের ব্যাপারটা বলুন।

ডঃ নরম্যান মারকাস চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে ঘরের এক প্রান্তে গেলেন। সেখানে কয়েকটা চেস্ট-অফ-ড্রয়ার ছিল। তিনি এক সেট ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতাম টিপলেন।

আসলে সেটা চেস্ট-অফ-ড্রয়ার নয়। ওপরের কাঠের আবরণ সরে গেল টেলিভিসন বক্সের মতো একটি যন্ত্র রয়েছে কিন্তু ঠিক টি ভি বক্স বা সেট নয়। ডঃ মারকাস নিজের রূপোর চাবিটি বার করে একটা তালায় ঘোরাতেই সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

তিনি বললেন, এই বিলডিং-এর সব নিচের তলায় অ্যাটম বোমাটি আছে। সেটি ফাটাবার চাবি এখানেই রয়েছে, বলে তিনি সেই বাক্স মতো যন্ত্রটি দেখালেন, এই যে আমি আমার চাবি ঘোরালুম এর দ্বারা অ্যাটম বোমা এখন ফাটাবার জন্যে রেডি। রূপোর চাবি আর খোলা যাবে না কিন্তু বিল তার লাল চাবি তালায় লাগিয়ে নিজের চাবি এবং রূপোর চাবিও খুলতে পারবে, তবে দুটো চাবি খুলতে হলে তিন মিনিটের মধ্যে খুলতে হবে। তিন মিনিট পূর্ণ হলেই এবং ইতিমধ্যে বিল যদি লাল চাবি এবং রূপোর চাবি বার করে না নেয় তাহলে বোমা ফেটে যাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ তিন মিনিট বিল শেষ বারের মতো চিন্তা করার সময় পাবে, বোমা ফাটানো হবে কি না হবে।

কিন্তু ডক্টর মারকাস এই অতি দুরূহ ও গুরুত্ব পূর্ণ কাজটির ভার আমকে দেওয়া হচ্ছে কেন?

ডঃ মারকাস উত্তর দিলেন, তার কারণ তুমি অবিবাহিত। আমরা কমপিউটার মারফত পরীক্ষা করে দেখেছি যে বিবাহিত মানুষ অপেক্ষা অবিবাহিত মানুষ অনেক কম সময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারপর আমরা আমাকে সমেত পাঁচজনকে কি-ম্যান নির্বাচন করেছিলুম,

কিন্তু কমপিউটারে ব্রেন রিডিং নিয়ে দেখা গেল যে পরীক্ষায় তুমি প্রথম হয়েছ। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত আর নড়চড় করা যাবে না।

কোথাও একটা ঘড়ি বাজল। কিছু দেরি হয়ে গেছে কারণ সেই ৪৯ ও ৫০ পাতা ডঃ ইয়ংকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। তার পড়তে কিছু সময় লেগেছিল।

ডঃ মারকাস তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন। তিনি ঘড়ি দেখে বললেন, আমাদের সকলকে আবার নতুন করে প্রতিষেধক নিতে হবে, সেজন্যে সময় লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা। কাজ এখনি আরম্ভ করতে হবে। ক্যাপসুল, মানে হাইড্রা ইনস্টিটিউটে এসে গেছে।

ডঃ মারকাস আবার সেই চেস্ট-অফ-ড্রয়ারের কাছে গিয়ে কোথাও একটা বোতাম টিপলেন। কাঠের আবরণ সরে গিয়ে একটা টিভি পর্দা বেরিয়ে পড়লো, দেখা গেল প্ল্যাস্টিক ব্যাগে আবৃত 'হাইড্রা' নিচে নামছে, দুটো যান্ত্রিক হাত তাকে ধরে আছে।

ডঃ মারকাস বললেন, মেলোটাউন থেকে আমরা হাইড্রা ছাড়া দুটো সারপ্রাইজ এনেছি, এই দেখ বলে ডঃ মারকাস একটা নব্ ঘোরালেন, দেখা গেল একটা বেডে হেজার ডেভিস শুয়ে আছে।

ডঃ মারকাস বললেন, প্লেন থেকে তোলা ছবিতে এই লোকটিকেই দেখা গিয়েছিল, এখন অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে, ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আমরা যখন ওকে তুলে আনি তখন ও রক্তবমি করছিল অথচ ওখানে আমরা ডেডবডি কেটেও দেখেছি সকলের শরীরের ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে, শীতকালে পাইপে যেমন জল জমে। ওকে ডেক্স-ট্রোজ ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে।

ডঃ মারকাস আবার নব্ ঘোরালেন, এবার শিশুটিকে দেখা গেল। তাকে ক্ষুদে বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কাঁদছে। তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। তাকে মাঝে মাঝে খাওয়ানো হচ্ছে।

ডঃ মারকাস বললেন, এই শিশুটিও বেঁচে গেছে, একেও আমরা ফেলে

আসতে পারি নি। একটা ব্যাপার আমরা প্রথম নজরে লক্ষ্য করি যে যারা দীর্ঘ সময় অভুক্ত ছিল তাদের মরতে কিছু বিলম্ব হয়েছে। যাই হোক সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ইতিমধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মেলোটাউন ভূমিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে যাতে সেখান থেকে কোনোরকম সংক্রমণ হতে না পারে।

মেলোটাউনে তিনি এবং গ্যারি হাস্টন কি দেখেছিলেন তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে বললেন, কারও কোনো প্রশ্ন আছে? কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না কারণ প্রশ্ন করে লাভ নেই, সবই তো অজ্ঞাত।

কোনো প্রশ্ন নেই? ডঃ মারকাস জিজ্ঞাসা করে বললেন, তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক।

ওরা চারজন, ডঃ মারকাস, গ্যারি হাস্টন, উইলিয়ম ইয়ং এবং স্যাম চেসার, "টু লেভেল টু" লেখা একটা দরজা খুলে একটা ঘরে ঢুকল, দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে হিস্‌স্‌ মতো একটা আওয়াজ করে বেশ চেপে বন্ধ হয়ে গেল। দরজার উলটো দিকে লেখা আছে "এই দরজা দিয়ে বেরোন যাবে না।

ঘরের মেঝেতে বাথরুমের মতো টালি বসান। ঘরে ধাতু নির্মিত বড একটা গামলা মতো পাত্র ব্যতীত আর কিছু নেই। গামলার মাথায় লেখা আছে "পরিধেয়"।

সকলে নিজের ইউনিফর্ম খুলে সেই গামলায় জমা দিল। গামলায় আগুন জ্বলে উঠলো, সব পোশাক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিছু পরে ছাই-গুলো চেঁছেপুছে কে যেন ভেতর দিকে টেনে নিল। গামলা আগের মতোই পরিষ্কার।

ঘরের বিপরীত দিকে একটা দরজা ছিল। তাতে লেখা "একজিট"। সকলে সেই দরজা দিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকলো। ঘরটা বাষ্পয় ভর্তি, একটা হালকা গন্ধ। জীবাণুনাশক কোনো ওষুধের মৃদু গন্ধ। সকলে একটা বেঞ্চে আলগা হয়ে বসে বাষ্প গায়ে লাগাতে লাগলো। উষ্ণ বাষ্প

চামড়ার ছিদ্রগুলির মুখ বড় করে দিচ্ছে,বাষ্প ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে।
এই ঘরের পর আর একটা ঘর। সেই ঘরে রয়েছে অগভীর বেশ বড়ো একটা চৌবাচ্ছা আর মাথার ওপর শাওয়ার। নির্দেশ লেখা আছে "চৌবাচ্ছায় পা ডুবিয়ে শাওয়ার খুলে দাও, তবে শাওয়াবেব জল খেয়ে ফেলো না।"
শাওয়ার থেকে যা পড়ছে তাও কোনো জীবাণুনাশক মিশ্রিত জল। ডঃ ইয়ং-এর মনে হলো গন্ধটা চেনা। কিছুক্ষণ ভাববার পর মনে পড়লো। জলের সঙ্গে যেটা মেশানো আছে সেটা অ্যালফা ক্লোরোফিন।
ডঃ মারকাস মন্তব্য করলেন, মানবদেহ সর্বাপেক্ষা অপরিষ্কার তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কাব করতে ও দেহকে জীবাণুমুক্ত করতে এত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে তবে সেই সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় জীবাণুগুলিকে যেন যথাসম্ভব রক্ষা কবা যায়। আবার এও দেখতে হবে যে মানুষটাই যেন মরে না যায়।
নির্ধারিত সময় পার হবার পর শাওয়াব বন্ধ করে চারজন চৌবাচ্ছা থেকে বেরিয়ে এলো, গা থেকে তখন জল ঝরছে। তোয়ালের জন্যে ইয়ং এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। তোয়ালে নেই। ওরা চারজন পাশের ঘরে প্রবেশ করল। সিলিং থেকে গরম হাওয়া নেমে এসে ওদের দেহ শুকিয়ে দিল। তাবপর দেওয়ালেব কোনো গোপন স্থান থেকে আলট্রা-ভায়োলেট আলো বেরিয়ে ওদেব দেহ আবৃত করে দিল। গরম হাওয়াও চলছে।
ঠিক সময়ে একটা সংকেত শোনা গেল আর সেই সঙ্গে গরম হাওয়া বন্ধ ও আলট্রা-ভায়োলেট আলো নিবে গেল।
শেষ ঘরে যখন ইয়ং বাকি তিনজনের সঙ্গে ঢুকলো তখন ওর মনে হলো কে যেন গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এ ঘরে হালকা হলদে রঙের পোশাক রয়েছে তবে ও পোশাকগুলো আগের গোলাপী রঙের পোশাকগুলোর মতো নয়, সার্জন বা কেমিস্টরা যেমন এপ্রন পরেন অনেকটা সেইরকম হাঁটু পর্যন্ত ঝুলওয়ালা যেন হাওয়াই শার্ট। প্যান্টগুলোর কোমরে ইলাস্টিক লাগান। ব্যালে নর্তকদের মতো পায়ে রবারসোল জুতো

তবুও বেশ কসে হেলমেট বেশ আরামদায়ক।

এপ্রনটি বেশ নরম, বোধহয় কোনো রকম সিনথেটিক। চোখ ধাঁধানো সকলের সঙ্গে "দু' নম্বর লেভেলে যাওয়ার দরজা" দিয়ে বেরিয়ে সাবা চড়লেন। দু'নম্বর লেভেলের রং হলদে, এই লেভেলের সকল কর্মীর পরণে হলদে পোশাক।

এই লেভেলে পৌঁছে ওরা সকলে একটা ছোট ঘরে এলেন, দরজায় লেখা "সাময়িক বিরাম।" ঘরে প্লাস্টিকের কভার ঢাকা দু'খানা নরম কৌচ।

ডঃ মারকাস বললেন, ইচ্ছে করলে ঘুমিয়ে নিতে পার, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নাও কারণ এরপর কাজগুলো একটু কষ্টসাধ্য, তারপর মিটিং আছে।

কথা শেষ করে ডঃ মারকাস একটা কৌচে শুয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। তিনি যে-কোনো সময়ে যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। ঘুম তাঁর করায়ত্ত।

ঘুম ও বিশ্রামের পালা চুকলো। এবার আর একটা ঘরে যাবার আগে সকলেই পরিধেয় ইউনিফর্মগুলি ও জুতো পূর্বের মতো একটা গামলায় জমা দিল। সব পুড়ে ছাই।

ডঃ ইয়ং জিজ্ঞাসা করলো, বারবার ইউনিফর্ম পোড়ানো কেন? এটা তো দেখছি বাজে খরচ।

গ্যারি হাস্টন বললো, এইসব পোশাক কাগজের তৈরি, সস্তা। চল অন্য ঘরে।

এই ঘরে বেশ বড় বড় কয়েকটা চৌবাচ্চা, মানুষ শুতে পারে। দেওয়ালে লেখা আছে "জলে ডুবে থাকার সময় চোখ খুলে রাখ।" চোখ একটু জ্বালা করেছিল, এমন কিছু নয়। এ ঘরের পালা চুকিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকতে হলো। ডঃ ইয়ং ভাবছে কত ঘর আছে রে বাপু, ঘরের বুঝি শেষ নেই।

এই তৃতীয় ঘরে টেলিফোন বুথের মতো কাঁচের দেওয়ালওয়ালা ছ'টা বুথ রয়েছে। বাইরে লেখা আছে "ভেতরে ঢুকেই দুই চোখ বন্ধ করবে।

হাত দুটো এবং পা দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়াবে। সংকেত-ধ্বনি শুনবে তারপর চোখ খুলবে। লং ওয়েভ রেডিয়েশনের ফলে অন্ধ হয়ে যেতে পার।"

ডঃ ইয়ং অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করতে লাগলো। সে একটা শীতল তাপ অনুভব করতে লাগলো। বড় অদ্ভুত। পাঁচ মিনিট, তারপরই সংকেত-ধ্বনি। কয়েক সেকেণ্ড পরে চোখ খুললো। দেহটা খটখটে শুকনো মনে হলো।

এই ঘর থেকে সকলকে একটা করিডরে আসতে হলো। এখানে পর পর চারটে শাওয়ার। শাওয়ারে গা ভিজিয়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই চার-দিক থেকে গরম বাতাস এসে গা শুকিয়ে দিল। গা শুকোবার পর সাদা পোশাক পরতে হলো। দু'নম্বর লেভেল থেকে চলো তিন নম্বরে।

চারজনের জন্যে চারজন নার্স অপেক্ষা করছিল। ইয়ংকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘরে কোনো মেসিন নেই, আছে একজন অল্পবয়স্ক ডাক্তার যে হাসতে জানে না। হাজার রকম প্রশ্ন ও পরীক্ষা করে জন্মেছ, কতদূর পড়াশোনা করেছ, দেশভ্রমণ করেছ? বংশ পরিচয় বল, কবে হাসপাতালে গিয়েছিলে? শেষ অসুখ? তারপর হার্ট, লাংস পরীক্ষা, ওজন, ছাতির মাপ, হাঁটুতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

ইয়ং দু'ঘণ্টা পরে ছাড়া পেল। এবার সকলের সঙ্গে চার নম্বর লেভেল। নিস্তার কি আছে। তাই ডঃ মারকাস বলেছিলেন পরের ধাপগুলো কঠিন, এবেলা ঘুমিয়ে নাও। জলে ডুবে চারবার স্নান, তিনবার আলট্রা-ভায়োলেট এবং ইনফ্রা-রেড আলো, দু'বার আলট্রাসনিক কম্পন গ্রহণ এবং তারপর এমন একটা ব্যাপার যা তার জানা ছিল না।

ইস্পাতের ছোট একটা ঘর যার মধ্যে একজন মানুষই দাঁড়াতে পারে, ভেতরে একটা পেরেকে একটা হেলমেট ঝুলছে। ঘরের বাইরে লেখা আছে "আলট্রা-ফ্ল্যাশ অ্যাপারেটাস। মাথার চুল ও গোঁফদাড়ি বাঁচাবার জন্যে বেশ চেপে হেলমেট পর তারপর পা দিয়ে নিচে বোতামটা টিপে দাও।"

আলট্রা-ফ্ল্যাশ সম্বন্ধে উইলিয়ম কিছু শোনে নি তবুও বেশ কসে হেলমেট পরে কি হবে না জেনে পায়ের নিচে বোতাম টিপে দিলো। চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় ঘর ভরে গেল এবং একটা তাপ প্রবাহ চলতে লাগলো। সারা দেহে একটা ব্যথা অনুভব করলো তবে সব ব্যাপারটাই ঘটলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। শব্দ-সংকেত শোনার পরই ব্যথা অন্তর্হিত। সাবধানে হেলমেট খুলে নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখলো। সারা দেহে কে যেন সাদা ছাই লাগিয়ে দিয়েছে। হাজার হোক সে বিজ্ঞানী তো তাই বুঝলো ছাই নয় তার দেহের ওপরের পাতলা ত্বক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এরপর শাওয়ারের নিচে স্নান, ছাই ধুয়ে গেল। এরপর সবুজ পোশাক।

এবার বোধহয় শেষ পরীক্ষা। থুতু, লালা, রক্ত, ইউরিন, স্টুল সব কিছুর নমুনা নেওয়া হলো। সে-সব পরীক্ষা করা হবে। কিছু প্রশ্নও করা হলো। উইলিয়ম বিরক্ত ও ক্লান্ত।

সব পরীক্ষা শেষ হলো। ও এবং অন্যান্যরা ডঃ মারকাসের সঙ্গে মিলিত হলো। ডঃ মারকাস বললেন নিয়ম অনুসারে আমাদের এই লেভেলে ছ'ঘণ্টা থাকতে হবে। ইতিমধ্যে ওরা আমাদের থুতু ইত্যাদির ল্যাবরেটার টেস্ট শেষ করবে। আমরা সকলেই ক্লান্ত, ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। ঐ করিডর বরাবর প্রত্যেকের নাম লেখা ঘর আছে। ওধারে একটা কাফেটারিয়াও আছে। পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা ওখানে মিটিং করবো।

উইলিয়ম দেখলো একটা দরজার গায়ে তার নাম লেখা একটা প্লাস্টিক বোর্ড রয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখলো বেশ বড় ঘর। খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, কাবার্ড সবকিছুই আছে। এসব ছাড়া টিভি পর্দা সমেত একটা পোর্টেবল কমপিউটার আছে।

শোবার ঘরেও কমপিউটার? কিন্তু উইলিয়ম তখন ক্লান্ত, কিছু ভাল লাগছে না। পরে খোঁজ করা যাবে। এখন ঘুমনো যাক।

বিছানা নরম হলে কি হবে গ্যারি হাস্টনের ঘুম আসছে না। সিলিং-এর দিকে চেয়ে সে চিন্তা করছে। মেলোটাউনে যে দৃশ্য সে দেখে এসেছে

তা ভুলতে পারছে না। তার চিন্তার প্রধান কারণ মানুষগুলোর রক্ত জমাট বাঁধলো কি করে ?

যদিও সে রক্ত নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করেছে তথাপি সে রক্ত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয়। সে হেমাটোলজিস্ট নয়। সে জানে রক্তের ওপর জীবাণুরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করে সে দেখেছে যে এই জীবাণু দু'রকম এনজাইম সৃষ্টি করে রক্তে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এরকম এনজাইম হলো একসোটকসিন যা ত্বক নষ্ট করতে পারে এবং লাল রক্ত কণিকা গলিয়ে দিতে পারে। আর অন্য এনজাইমটির দানা বাঁধার ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে জীবাণুগুলির ওপর প্রোটিনের আবরণ তৈরি করে জীবাণুকে শক্তিশালী করে আর সেই জীবাণু রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে। অতএব জীবাণু রক্ত নষ্ট করতে পারে।

স্ট্রেপটোকক্কাই, নিউমোকক্কাই, অ্যামিবা এরাও নানাভাবে রক্তের ক্ষতি-সাধন করে মানুষকে গুরুতর অসুখের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

কিন্তু এটা ঠিক যে হাইড্রা ক্যাপসুলে সাংঘাতিক কোনো জীবাণু আছে এবং সেই জীবাণু দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিতে পারে। সেই জীবাণু এ কাজ করে কি করে ? সে জীবাণু রক্ত জমিয়ে দিতে পারে তার পর পর এনজাইম সৃষ্টি করে রক্ত জমিয়ে দেয় তাদের সে মাইক্রোস্কোপে দেখেছে, তাদের সে চেনে কিন্তু এ কোন্ জীবাণু ?

স্যাম চেসার যে ডঃ উইলিয়ম ইংয়কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সেও জীবাণু সম্বন্ধে কিছু কম জানে না। সে একজন নামী মাইক্রো-বায়লোজিস্ট, কিন্তু মেলোটাউনের ব্যাপার তারও মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। সে ভাবছে হাইড্রা যদি কোনো জীবাণু আকাশ থেকে নিয়ে এসে থাকে এবং সম্ভবত এনেছে তাহলে সেই জীবাণু এতই মারাত্মক যে তার সমতুল কোনো জীবাণু পৃথিবীতে আছে বলে তার জানা নেই তাহলে সেই জীবাণু নিয়ে তারা কি করে কাজ করবে।

মহাকাশে জীবাণু থাকতে পারে। তাদের সংগ্রহ করে তাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার এমন চিন্তা যে কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী করেছিলেন

তাদের মধ্যে স্যাম চেসার অন্যতম। আকাশ থেকে যদি কোনো জীবাণু পাওয়া যায় তাহলে তারা সকলেই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নাও হতে পারে, কিছু জীবাণু মানুষের উপকারও করতে পারে। এমন জীবাণু অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে। হেমোফিলিয়া নামে একরকম রোগ আছে, যে রোগে রক্তপাত বন্ধ হয় না, রোগী মারা যায়। এমন ক্ষেত্রে হাইড্রায় প্রাপ্ত জীবাণুকে কাজে লাগিয়ে কি হেমোফিলিয়া আরোগ্য করা যাবে না?

তার মাথায় আরও একটা চিন্তা ঘুর ঘুর করে। পৃথিবীতে দেখা যায় যে জীব যত বুদ্ধিমান হয় তার দেহ তত জটিল হয়, আকারে বড়ও হয় সেই সঙ্গে তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠনও জটিল হতে থাকে। অতীতে ডাইনোসর সমূহ প্রাণীগুলি আকারে বৃহৎ ছিল কিন্তু তাদের মাথা ছিল খুব ছোট তাই তারা জীবাণুযুদ্ধে হেরে ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে মহাশূন্যে কোনো গ্রহে এমন বুদ্ধিমান জীব আছে যারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে তাদের মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়। সেই জীব ক্রমবিকাশ দ্বারা নিজেদের ক্ষুদ্র করে নিয়েছে। ক্ষুদ্র হলে অনেক সুবিধে। কাঁচামাল কম লাগে, আহার্য কম লাগে, বাস করবার জন্যে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তৈরি করতে হয় না।

এমন কোনো জীব যদি কোনো স্যাটেলাইট মারফত ধরা পড়ে তাহলে তাদের আমরা চিনবো কি করে? এ নিয়ে একটা কৌতুক আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকটিরিওলজিস্ট স্যামার্স নীরস বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি একবার ঠাট্টা করে তাঁর এক সহকর্মীকে বলেছিলেন, আরে ভাই একবার মাইক্রোস্কোপে অচেনা ব্যাকটিরিয়া দেখছি। সেগুলো জীবন্ত, নড়াচড়া করছিল। হঠাৎ দেখি আমার স্লাইডে লেখা হয়ে গেছে: "আমাদের তোমার নেতার কাছে নিয়ে চল।"

ডঃ মারকাস ভাবছেন পৃথিবীতে অসংখ্য উল্কা পড়েছে। কোনো কোনো উল্কা জীবাণু বহন করে এনেছে, পৃথিবীর আবহাওয়ায় তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে নি কিংবা তারা নতুন পরিবেশে নিজেদের রূপান্তর ঘটিয়েছে। উল্কার জীবাণু নিয়ে হাঙ্গেরির রুডলফ কার্প যে

গবেষণা করেছিল তিনি আজকের মিটিংএ তা জানাবেন।

ডঃ উইলিয়ম ইয়ং ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের আর দোষ কি? যে ধকল তার শরারের ওপর দিয়ে গেছে তাতে তো ঘুম আসা স্বাভাবিক। এবার উঠে পড়ুন স্যার, সুরেলা নারীকণ্ঠের ডাকে উইলিয়ামের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে বললো. হ্যালো।

এবার উঠে পড়ুন স্যার।

আরে তুমি কোথায়?

উইলিয়াম হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। কাউকে দেখতে পেল না। যাই হোক, নিশ্চয় ওঠবার সময় হয়েছে কিন্তু ক'টা বেজেছে তা জানা গেল না. তার রিস্টওয়াচ তো আগেই খুলে রাখতে হয়েছে। অল্প সময় হলেও ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়েছিল। হাত পা নেড়ে আলস্য ভেঙে সে কাফেটেরিয়ার দিকে চলল, মিটিং হবে, ডঃ মারকাস বলে দিয়েছিলেন।

স্যাম চেসার ছাড়া কাফেটেরিয়াতে আর কেউ ছিল না। সে বললো, সকলে কনফারেন্স রুমে আছে, ব্রেকফাস্ট সেরে আমরাও যাব, এই নাও এইটে খেয়ে নাও, আঠারো ঘণ্টা ফিট থাকবে, এর মধ্যে চল্লিশটারও বেশি পুষ্টিকর উপাদান মেশানো আছে।

স্যাম তার দিকে বাদামী রঙের এক গেলাস পানীয় এগিয়ে দিল।

বেশ লেবু লেবু গন্ধ, খারাপ লাগলো না, অরেঞ্জ জুস পান করার মতো উইলিয়ম সেটা খেয়ে নিল তবে বাদামী পানীয়তে লেবু গন্ধটা খাপ খায় না।

স্যাম বললো, এই বিশেষ পানীয় তৈরি করা হয়েছে অ্যাস্ট্রোনটদের জন্য। আচ্ছা এবার এই পিলটা খেয়ে নাও, তারপর কফি।

উইলিয়ম ইয়ং পিলটা গিলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে এদিক ওদিক দেখে বললো, চিনি আছে?

না, এখানে তুমি কোথাও চিনি পাবে না, শরীরের ভেতরে কোথাও জীবাণু জন্মাতে বা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এমন কিছু তুমি এখানে পাবে না। আমরা সকলে হাই-প্রোটিন ডায়েটে আছি, শরীরের ভেতরে প্রোটিন

ভেঙে প্রয়োজনীয় চিনি তৈরি করে নেবে।

কফি শেষ করে ওরা কনফারেন্স রুমে এল। কনফারেন্স রুমে জীবাণু সংক্রান্ত নানা আলোচনা হলো।

ডঃ মারকাস বললেন, উল্কাতে যে জীবাণু থাকতে পারে তা প্রমাণ করেছেন ডঃ রুডলফ কার্প। হাঙ্গেরিতে তাঁর জন্ম কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হন এবং পরে ১৯৫১ সাল নাগাদ অ্যামেরিকায় চলে আসেন এবং মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন।

কার্প উল্কার জীবাণু পাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। প্রতিটি উল্কা তিনি পর পর বারোটি সলিউশনে ধুয়ে নিতেন যার মধ্যে থাকত পারঅক্সাইড, আয়োডিন, হাইপারটনিক স্যালাইন এবং তরল অ্যাসিড। তারপর সেই উল্কাখণ্ডকে দু'দিন আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নিচে রাখতেন এবং সর্বশেষে জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজিয়ে রাখার পর বিশোধিত আধারে রেখে পরীক্ষা করতেন। এরকম করার কারণ পার্থিব কোনো জীবাণু ঐ উল্কাখণ্ডে লেগে থাকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এইভাবে অনেক উল্কা পরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত সাফল্য। একটি উল্কা-খণ্ডে তিনি ক্ষুদ্র গোলাকার জীবাণুর সন্ধান পান এবং সেগুলি তখনও বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম ছিল। তিনি বলেন, এই জীবাণুগুলি পার্থিব জীবাণুর মতো প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড দ্বারা গঠিত কিন্তু এদের নিউক্লিয়াস খুঁজে পান নি।

কার্পের এই আবিষ্কার জীবাণুবিদরা মেনে নেন নি উপরন্তু তাঁরা বিদ্রূপ করেছিলেন। কার্প হতোদ্যম হয়ে আর অগ্রসর হন নি। তিনি উল্কা থেকে প্রাপ্ত জীবাণুর যে নমুনা রেখেছিলেন তা ল্যাবরেটরিতে এক বিস্ফোরণের ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

ডঃ মারকাস বলেন, জীবাণুরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং এরা অবিনাশী। প্রচণ্ড তাপেও মরে না, উপরন্তু বংশ বৃদ্ধি করে এমন জীবাণুও আছে। মিশরে মমির গায়েও জীবাণু পাওয়া গেছে যারা কয়েক হাজার বছর ধরে বেঁচে ছিল। ব্যাকটিরিয়ারা প্রয়োজনবোধে ডিমের খোলের মতো ক্যালসিয়ম দ্বারা নিজের ক্ষুদ্র কোষটিকে আবৃত করে নিজেকে প্রতি-

কূল পরিবেশেও রক্ষা করতে পারে। আবৃত এই জীবাণু সহজে ধ্বংস হয় না। এবং এরা এই অবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, এমন কি মহাশূন্যেও পৌঁছে যেতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে এরা আবরণ ভেঙে আবার বংশ বৃদ্ধি শুরু করে।

স্যাম চেসার একটা প্রশ্ন তুলে নিজেই তার জবাব দেবার চেষ্টা করলো। সে প্রশ্ন করলো,"আমরা সন্দেহ করছি অন্য গ্রহ থেকেও জীবাণু আসছে। অন্য গ্রহে জীবাণু উৎপাদিত হচ্ছে ইত্যাদি কিন্তু সত্যই কি তাই ?"

স্যাম চেসার বললো, আমিও বলি জীবাণুরা কয়েক লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবী থেকেই মহাশূন্যে পৌঁছে সেখানে বাসা বেঁধেছে। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি সমুদ্রতেই হয়েছিল। এককোষী সেই প্রাণ আজও পৃথিবীব সর্বত্র বাসা বেঁধে রয়েছে, তার নাম অ্যামিবা।

তখন পৃথিবীতে আব কোনো প্রাণীর সৃষ্টি হয় নি। মানুষ তখন অনেক দূরে। সেই এককোষী প্রাণী সমুদ্র থেকে ডাঙায় আসে এবং ঝড়ের সময় উড়তে উড়তে শূন্যে উঠে যায়। সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মহা শূন্যে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং ক্রমে তারা নিজেদের মধ্যে পরি-বর্তন ঘটিয়ে অন্য রূপ নিতে থাকে। নতুন পরিবেশে মূল অ্যামিবা থেকে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি হয় আর সেই সব ব্যাকটিরিয়া পৃথিবীতে ফিরে আসছে।

দেখা গেছে গভীর সমুদ্রের অতল তলে যেখানে আলো পৌঁছয় না, অক্সিজেনও কম, প্রচণ্ড চাপ, সেখানেও ব্যাকটিরিয়া তো বটেই অন্য প্রাণীও প্রচুর দেখা যায়। এমন প্রতিকূল পরিবেশে যদি জীবাণুরা বাস করতে পারে তাহলে শূন্যেই বা থাকতে পারবে না কেন ?

মানুষ জন্মাবার আগে যে জীবাণুর সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে জীবাণু শূন্যে বাসা বেঁধেছে সে যদি শূন্য থেকে মানুষের কাছে ফিরে আসে তবে মানুষ তাকে চিনতে পারবে না। স্যাম চেসারের মতবাদ হলো যেসব জীবাণু শূন্যে বিচরণ করছে তাদের আদি বাসভূমি হলো এই পৃথিবী।

স্যাম চেসারের পর আরও কেউ কিছু বললো। হাইড্রাতে যে জীবাণু আছে তার রূপ কিরকম হবে এবং কি সতর্কতা অবলম্বন করা হবে তা

নিয়ে, কিছুক্ষণ আলোচনা হলো।

যে স্বর ডঃ উইলিয়ম ইয়ং-এর ঘুম ভাঙিয়েছিল সেই অদৃশ্য স্বর আবার শোনা গেল, আপনারা এবার পরবর্তী লেভেলে যেতে পারেন।

পাঁচ নম্বর লেভেলের রং নীল, এই লেভেলের কর্মীদের পোশাকের রং নীল। গ্যারি হাস্টন ঘুরে ঘুরে ডঃ ইয়ংকে সমস্ত লেভেলটা দেখালো। এই ফ্লোরে এডিসন ইনস্টিটিউটের অবিজ্ঞানী কর্মী ও কলাকুশলীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হাইড্রা-এর জন্যে জরুরী ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কর্মীদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাঝখানে একটি বড় ঘরে হাইড্রাকে একটা বিশেষ চেম্বারে রাখা হয়েছে। মেলোটাউন থেকে তুলে আনা হেজার ডেভিস ও রেবিটিকেও এখানেই রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা, কারও সঙ্গে কারও ছোয়া-ছুঁয়ি হবার উপায় নেই। হাইড্রা এবং ডেভিস ও রেবিকে পৃথক ভাবে সীল করে দেওয়া হয়েছে।

ডঃ ইয়ং প্রশ্ন করলো, সীল যদি করে দেওয়া থাকে তাহলে ওদের নিয়ে কাজ করবো কি করে?

গ্যারি হাস্টন বললো, গ্লাভ বক্স জান?

ইয়ং ঘাড় নেড়ে জানাল সে জানে না।

গ্যারি তখন বললো, গ্লাভ বক্স উত্তম প্লাষ্টিক নির্মিত একটি বাক্স। এই বাক্সর সাহায্যে সম্পর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করা ও বিশেষভাবে শোধন করা অর্থাৎ আমরা যাকে ষ্টিরাইল বলি সেই সব সজীব বা নির্জীব পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয়। এই সব বাক্সর দু'ধারে দুটি হাত থাকে, হাতের প্রান্তে গ্লাভস লাগানো আছে। আমরা সেই বাক্সয় ঢুকে বাক্সর হাতের মধ্যে আমাদের হাত ঢুকিয়ে দিই এবং আমাদের আপাদমস্তক সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে একটা ধুলিকণা বা জীবাণু ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না বা আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষাধীন পদার্থে লাগতে পারে না। আমাদের আঙুলও তাদের স্পর্শ করে না। হাতে তো গ্লাভস পরা থাকে।

উইলিয়ম ইয়ং বললো, তাহলে এটাকে প্লাষ্টিক বক্স না বলে প্লাষ্টিক স্যুট বলাই তো উচিত যা পরে ডঃ মারকাস ও তুমি মেলোটাউনে নেমেছিলে. তাই নয় কি ?

তা বলতে পার, তবে এই স্যুট পরে কাজ করতে অসুবিধে হবে না, সড়গড় হতে কয়েক মিনিট সময় লাগে মাত্র।

ওরা দু'জনে 'সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল' লেখা একটা ঘরে ঢুকলো। ডঃ মারকস এবং স্যাম চেসার আগেই এসে গেছে। তারা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে নানা রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কোনো আওয়াজ নেই, শান্ত।

মাঝে কাঁচের একটা স্বচ্ছ দেওয়াল। এধার থেকে ওধার দেখা যাচ্ছে। উইলিয়ম ইয়ং দেখতে পেলো ওধারে যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে হাইড্রাকে একটা টেবিলে নামানো হচ্ছে। উইলিয়ম আগে কখনও ক্যাপসুল দেখে নি। এখন আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল।

যান্ত্রিক হাত ডঃ মারকাস নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। টেবিলে নামাবার পর ঐ যান্ত্রিক হাত দিয়েই হাইড্রার প্রকোষ্ঠ একটা খুলে দেওয়া হলো।

ডঃ মারকাস বললেন, এবার আমাদের দেখতে হবে হাইড্রার ঐ প্রকোষ্ঠে হানিকর কি আছে বা নেই। তোমাদের কারও কোনো প্রস্তাব আছে?

স্যাম চেসার বললো, ইঁদুর।

গ্যারি হাস্টন বললো, ঠিক আছে, আগে ইঁদুরই হোক তারপর একটা বাঁদর।

ডঃ মারকাস আবার কণ্ট্রোলে হাত দিলেন। সেই যান্ত্রিক হাত দুটি বেশ লম্বা। দেওয়ালে খাঁচায় একটা ইঁদুর ছিল। যান্ত্রিক হাত খাঁচা থেকে ইঁদুর বার করে এনে খাঁচার সামনে বসিয়ে দিল। ইঁদুরটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ইঁদুরটা মরে গেল। মৃত্যু এত দ্রুত হলে পর্যবেক্ষণ করা দুরূহ। অন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তার আগে বাঁদর এনে দেখা যাক।

যান্ত্রিক হাত আবার সচল হলো। পাশে আর একটা ঘর থেকে একটা

প্রাপ্তবয়স্ক বাঁদর এনে হাইড্রার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। বাঁদরটা বুকে হাত দিল, একটু যেন অবাক হলো এবং তারপরই মরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

ডঃ মারকাস বললেন, আমরা এখন নিঃসন্দেহ যে হাইড্রার অভ্যন্তরে এমন কোনো জীবাণু ঢুকেছে এখনও বাতিমতো সক্রিয়। অতএব সাবধান।

ডঃ মারকাস কোথাও কোনো বোতাম টিপলেন। যে প্রকোষ্ঠ খোলা হয়েছিল যান্ত্রিক হাত সেই প্রকোষ্ঠ বন্ধ করে দিল।

ডঃ মারকাস বললেন, এবার আমরা অন্য যান্ত্রিক উপায়ে হাইড্রাকে পরীক্ষা করবো, দেখতে হবে ক্যাপসুলের গায়ে কিছু আটকে আছে কি না, গায়ে ওপরে না পাওয়া গেলে ভেতরটা খুলে দেখতে হবে।

গ্যারি হাস্টন প্রস্তাব করলো, আমি ঐ মরা জীবগুলো প্রথমে বাইরে থেকে ও পরে তাদের চিরে পরীক্ষা করবো।

ডঃ মারকাস সেই যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে মরা ইঁদুর ও বাঁদরটিকে তুলে একটি কনভেয়ার বেল্টের ওপর রাখলেন। কনভেয়ার বেল্ট চালু করা হলো। এখন সেই বেল্ট মৃত জীবটিকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে। মরা জীবজন্তু পরীক্ষা করবার আলাদা "অটোপসি রুম" আছে। সেই ঘরে যাবার জন্যে গ্যারি হাস্টন সিট ছেড়ে উঠলো।

ডঃ মারকাস বললেন, গ্যারি তোমার তো আরও একটা কাজ আছে। আমাদের তুমিই একমাত্র ডাক্তার। ঐ বেবি ও বৃদ্ধ যাদের আমরা মেলোটাউন থেকে তুলে এনেছি তাদের চিকিৎসা করতে হবে, জানতে হবে ওরা কি করে বেঁচে গেল। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে কম্পিউটার আছে। ওখানে তোমাকে একজন মহিলা সাহায্য করবে। তোমার যা দরকার জেন গেনরকে বললেই হবে।

বেবি এবং হেজার ডেভিসের চিকিৎসা করবার জন্যে গ্যারি হাস্টন যে ঘরে এল সেই ঘরের দরজার মাথায় লেখা আছে 'মিসলেনিয়স'। দরজা খোলবার সময় গ্যারি মনে মনে হাসল। তার কাজও তো মিসলেনিয়স।

ঘরখানা বেশ বড়। সেই ঘরের মধ্যে কাঁচের পার্টিশন দেওয়া আর একটা ঘর। সেই ঘরে দুটো বেডে শিশু ও বৃদ্ধ শুয়ে আছে। গ্যারি আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলো। কাঁচের ওধারে মানবাকৃতি চারটে প্লাস্টিক স্যুট রয়েছে। স্যুটগুলো এমনভাবে রাখা রয়েছে যে এধার থেকেই স্যুটের মধ্যে ঢোকা যায়। এইভাবে স্যুট পরে ওপারে গিয়ে সে কাজ করতে পারবে।

গ্যারি আরও দেখলো ঘরে মধ্যে একজন একটি পোর্টেবল কমপিউটরের সামনে বসে কাজ করছে। মহিলা বলেই মনে হলো।

গ্যারি ঘরে ঢুকলো। তার অনুমান ঠিক। মহিলা বললো তার নাম জেন গেনর। গ্যারিকে কমপিউটার কতখানি এবং কিভাবে সাহায্য করবে এবং সেটি কিভাবে চালাতে হয় জেন সবই তাকে বুঝিয়ে দিল। এই কমপিউটার দ্রুত কাজ করে। ল্যাবরেটরিতে যে পরীক্ষা করতে দু' দিন লাগে সে কাজ এই কমপিউটার কয়েক মিনিটে করে দেবে।

গ্যারি বললো, এমন যে কমপিউটার আছে তা আমি শুনেছি কিন্তু চাক্ষুষ দেখি নি।

জেন বললো, আপনি রোগীর সমস্ত লক্ষণ এই কমপিউটারকে জানিয়ে দিলে পরের ধাপে আপনাকে কি করতে হবে তাও এই যন্ত্র আপনাকে বলে দেবে।

গ্যারি এবার রোগী দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলো, এদের জন্যে কি করা হয়েছে ?

জেন বললো, এখানে আসার পর কিছু করা হয় নি তবে এই ইনস্টিটিউটে আসার পর এক নম্বর লেভেলে হেজার ডেভিসকে প্লাজমা আর বেবিকে ডেক্সট্রোজ ও জল দেওয়া হয়েছে। ওদের দেহ নির্জলা হয়ে যায় নি এবং এখনি বিপদের আশঙ্কা নেই। তবে ডেভিসের দেহে রক্তের অভাব আছে। সে এখনও অজ্ঞান হয়েই রয়েছে।

ডেভিসের রক্ত, ইউরিন, স্টুল, ইত্যাদি এখনি পরীক্ষা করা দরকার। তাছাড়া তার হার্ট ও লাংসের অবস্থা, ব্লাড প্রেসার, নাড়ীর গতি ও টেম্পারেচারও জানতে হবে।

জেন গেনরের সহায়তায় কমপিউটরের সাহায্যে সব তথ্য জানা গেল। ডেভিসের ব্লাডপ্রেসার লো, ৮৫।৫০ নাড়ী দ্রুত, ১১০ ; টেম্পারেচার ৯৭'৮ ; নিশ্বাস ৩০, গভীর।

ডেভিস অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কিংবা হয়তো অজ্ঞান নয়, আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গ্যারি ওর ভুরুর নিচে এক জায়গায় জোরে টিপে দিল। ডেভিস বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে গ্যারিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

গ্যারি তাকে একটু নাড়া দিয়ে ডাকলো, মিঃ ডেভিস, মিঃ ডেভিস। কোনো সাড়া নেই। গ্যারি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আবাব তার নাম ধবে ডাকলো এবং নাড়াও দিল।

এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখ খুলে বললো, আঃ সরে যাও ··যাও।

গ্যারি আস্তে আস্তে তাকে আরও কয়েকবার নাড়া দিল। ডেভিস অবসন্ন, শিথিল হয়ে সে চুপচাপ পড়ে রইলো।

গ্যারি হাস্টন এবার তার দেহ পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো। হার্ট মনে হলো স্বাভাবিক, লাংস পরিষ্কার তবে তলপেটে গোলমাল আছে বলে মনে হলো। একবার বমি করলো, কিছু বাজে জিনিসেব সঙ্গে রক্তও উঠে এল।

গ্যারি এবার কমপিউটরের সাহায্যে কয়েকটি পবীক্ষা আরম্ভ করলো। প্রথমে রক্ত নানাভাবে পরীক্ষা। পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেই গ্যারি বুঝলো ডেভিসকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে একটি রক্ত ও প্লাজমা দিতে হবে।

জেনকে বলতেই জেন টেলিফোন মারফত যথাস্থানে রক্ত ও প্লাজমা পাঠিয়ে দিতে বললো

এবার বেবিকে দেখতে হবে। উইলিয়ম হালে কোনো বেবিকে পরীক্ষা করে নি, কিছুটা অনভ্যাস। প্রথমে সে চাইলো বেবির চোখ দুটো পরীক্ষা করতে। যতবার সে চোখ খোলবার চেষ্টা করে ততবারই সে টিপে চোখ বন্ধ করে থাকে। গলা দেখবার জন্যে হাঁ করাবার চেষ্টা করে কিন্তু খুদে মানুষটি মুখ কিছুতেই খুলবে না ; ঠোঁট চেপে থাকে। বুকে স্টেথিস্কোপ বসাবার সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে দেয়। হৃদস্পন্দন স্পষ্টভাবে শোনা যায় না।

আধঘণ্টা ধবে প্রাণপণ চেষ্টা করে উইলিয়ম ইয়ং শিশুর পরীক্ষা শেষ করলো। কোনো ত্রুটি পাওয়া গেল না, তার মতে শিশু স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ঐ বৃদ্ধ এবং এই শিশুর মধ্যে কমন একটা কিছু আছে নইলে তারা সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে উদ্ধার পেল কি করে?

এডিসন ইনস্টিটিউটের মধ্যে সবচেয়ে দামী ঘর হলো "মেন কণ্ট্রোল রুম।" এই একটা ঘরের জন্যে খরচ হয়েছে দু'লক্ষ ডলার।

এই ঘরে বসে স্যাম চেসারের সঙ্গে ডঃ মারকাস বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রাকে পরীক্ষা করছেন। প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে ক্যাপসুলটার গায়ে কোনো মারাত্মক জীবাণু আছে কিনা, থাকলে তাকে চিনতে হবে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

মেন কণ্ট্রোল রুমে যেসব যন্ত্র ও সরঞ্জাম আছে তাদের সাহায্যে অজ্ঞাত স্থান থেকে অজ্ঞাত জীবাণু খুঁজে বার করা যায়। স্বয়ংক্রিয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র আছে, সেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি চালায় রোবট। অনুবীক্ষণে কি দেখা যাচ্ছে তার ছবি একটা পর্দায় প্রতিফলিত হয়।

সব প্রথমে হাইড্রার গা থেকে জীবাণু খুঁজে বার করতে হবে। খুবই দুরূহ কাজ। কোথাও হাত ঠেকানো যাবে না, সবই করতে হবে যন্ত্রের সাহায্যে।

যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে ডঃ মারকাস হাইড্রাকে আগে বিশেষ একটা জায়গায় সংস্থাপিত করলেন। ক্যাপসুলটা ঝুলতে থাকলো, ইচ্ছামতো ঘোরানো বা ওলটানো পালটানো যাবে।

ডঃ মারকাস ও স্যাম চেসার এবং ক্যাপসুলের মধ্যে কাঁচের পার্টিশন। এধারে ডায়াল দেখে হিসেব করে বোতাম টিপে কাজ করা হচ্ছে।

ডঃ মারকাস একটা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে সিলিং থেকে একটা কালো বাক্স নেমে এসে হাইড্রার চারদিকে ঘুরতে লাগলো। কালো বাক্সটা ওদের চোখের কাজ করবে, সে যা দেখবে তা একটা পর্দায় প্রতিফলিত হবে।

কিন্তু পর্দায় কিছু দেখা যায় না। ডঃ মারকাস জিজ্ঞাসা করলেন, কত

পাওয়ার ?

পাঁচ।

পাঁচ ? তুমি আস্তে আস্তে পাওয়ার বাড়িয়ে একশ' কর।

স্যাম চেসার তাই করলো। সে আস্তে আস্তে পাওয়ার বাড়াতে লাগলো, পর্দাও ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে লাগলো। পাওয়ার বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত ছবির আয়তনও বাড়বে।

ডঃ মারকাস বললেন, স্যাম তুমি ভাণ্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স কন্ট্রোলের রিপোর্টটা পড়েছিলে ?

হ্যাঁ পড়েছি। তুমি বলতে চাইছ তো যে হাইড্রার সঙ্গে উল্কা বা কোনো বস্তুর সম্পর্ক হয়েছিল যার জন্যে হাইড্রা কক্ষপথ থেকে কিছু বিচ্যুত হয়েছিল।

হতেই পারে, অনেক স্যাটেলাইট ও স্পেস ল্যাবরেটরির অনেক ভাঙা চোরা অংশ আকাশে ঘুরছে, তাদের কক্ষপথ জানা নেই কিংবা ভাঙা অংশ থেকে আরও কিছু ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে, ওজনের তারতম্য হচ্ছে, কক্ষপথও বদলাচ্ছে অতএব হাইড্রাকে যে কেউ ধাক্কা মারবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ?

স্যাম চেসার বললো, আমি পাওয়ার কিছু কমিয়ে দিচ্ছি, তাতে ছবি আরও ভালো পাওয়া যাবে, এই দেখ।

পর্দার ওপর আস্তে আস্তে ছবি ফুটে উঠছে। হাইড্রার গায়ে এক জায়গায় যেন ছোট একটা দানা আটকে রয়েছে। খুবই ছোট, বালুকণার মতো। কয়েকটা খুব ছোট ছোট ছাপ দেখা গেল, সবুজ, সঙ্গে কালো ছোপ। এসবই এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যাবে না।

সেই প্রতিফলিত ছবি দু'জনেই খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগলো। বালুকণার সমান ঐ দানা ও কালো মেশানো সবুজ ছাপগুলির মধ্যেই কি সেই সাংঘাতিক জীবাণু লুকিয়ে আছে ?

ওরা লক্ষ্য করতে লাগলো ঐ সব ছাপের আকার বা রঙের কোনো তারতম্য হয় কি না। দেখতে দেখতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দৃষ্টি আর স্থির রাখা যাচ্ছে না, চোখকে তো বটেই, দেহকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া

দরকার।

যন্ত্র বন্ধ রেখে ওরা দু'টি করে কেফিন ট্যাবলেট খেল। কয়েক মিনিট মাত্র বিশ্রাম নিয়ে ওরা আবার কাজ আরম্ভ করলো। আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ভাল হ'ত কিন্তু ওরা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

ডঃ মারকাস বললেন, চেসার পাওয়ার বাড়িয়ে দাও, একশ' কর।

চেসার পাওয়ার বাড়ালো। ক্ষুদ্র দানাটি ও ছাপগুলি আকারে বড় হলো কিন্তু নতুন কিছু দেখা বা বোঝা গেল না। ক্ষুদ্র দানাটি এখন মনে হচ্ছে ছোট একটা টিল, সবুজ ছাপগুলি বড় হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কি আছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

চেসার বললো, ভালো করে দেখ তো ডকটর, সবুজ ছাপগুলো একটু উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না?

চুপ করো চেসার, ঐ দেখ ঐ সবুজ ছাপটা যেন রং বদলাচ্ছে, এখন আর সবুজ নেই, রংটা লালচে-বেগুনি মনে হচ্ছে।

দু'জনে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ওরা কি অজানা এক জীবাণু বা ভাইরাস আবিষ্কার করতে চলেছে? লালচে-বেগুনি রং আবার সবুজ হলো, সবুজ আবার রং পালটে লালচে বেগুনি হলো। এই রংটাই রইল, পুনরায় সবুজ হলো না, আকার যেন খুব সামান্য বাড়লো।

ডঃ মারকাস উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না, দেখ দেখ চেসার ঐ সবুজ ছাপটা বড় হচ্ছে, ক্যামেরা সেট কর, তিনটে ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা।

স্যাস চেসার মুভি ক্যামেরা চালিয়ে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ডঃ মারকাস বললেন, এবার কি আমরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নেব?

দরকার কি? আমরা ঐ সবুজ ছাপ থেকে নমুনা তুলে নিয়ে কালচার করি না কেন। পেট্রি ডিশে মিডিয়া রেডি করা আছে।

কি কি মিডিয়া রেডি করেছ? ডঃ মারকাস জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ধরুন হর্স অ্যাণ্ড শিপ ব্লাড অ্যাগার, চকোলেট অ্যাগার, সিমপ্লেক্স, এ ছাড়া কতকগুলো স্পেশাল মিডিয়াও রেডি করেছি, জানি না তো

কোন্ মিডিয়াতে অজানা জীবাণু বংশবৃদ্ধি করবে।

উত্তম প্রস্তাব, তাহলে কাজ আরম্ভ করে দাও।

স্যাম চেসার 'কালচার' লেখা একটা বোতাম টিপলো। কোথা থেকে একটা ট্রে বেরিয়ে এল। ট্রে-তে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন রকমের মিডিয়া ভর্তি পেট্রি ডিশ। ডিসের ওপর প্লাস্টিকের ঢাকা। ট্রে-এর ওপর একটা বড় ঢাকা ছিল। পেট্রি ডিশগুলোর ঢাকা সমেত সেই বড় ঢাকা সরে গেল। যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এসে হাইড্রার গা থেকে চারটে সবুজ ছাপ থেকে সোয়ারের সাহায্যে নমুনা সংগ্রহ করে পেট্রি ডিশের মিডিয়াতে স্পর্শ করিয়ে দিল।

কোন্ সবুজ ছাপের নমুনা কোন্ পেট্রিতে রাখা হলো ডঃ মারকাস তা লিখে রাখলেন। নমুনা সংগ্রহ হবার পর প্রত্যেক মিডিয়া ডিশের ওপর এবং সবশেষে ট্রে-এর ওপর ঢাকা পড়ে গেল। সবশেষে সেটিকে যথা-স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দেখা যাক, কি জীবাণু পাওয়া যায়, চেনা না অচেনা।

স্যাম চেসার বললো, এইবার আমরা ইলেকট্রনিক সাহায্যে ঐ ক্ষুদে দানাটা পরীক্ষা করবো।

ডঃ মারকাস তখন 'ম্যাক্সকাল্ট' নামে একটা কমপিউটর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পেট্রি ডিশগুলিকে বিভিন্ন তাপের চেম্বারে পাঠাচ্ছিলেন। বাকি সব কাজ কমপিউটর করে ফলাফল জানিয়ে দেবে।

কাজ শেষ করে ডঃ মারকাস বললেন, স্যাম এবার তুমি···

মেডিক্যাল অর্থাৎ যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে ক্ষুদে ফরসেপ দিয়ে ক্ষুদে দানা তুলে পরীক্ষা করবার জন্যে যখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা হলো তখন ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে এবং ওরাও টানা এগারো ঘণ্টা কাজ করেছে। আজ আর পারা যাচ্ছে না। ডঃ মারকাস বললেন, স্যাম আজ এই পর্যন্ত থাক।

গ্যারি হাস্টন দুরূহ পরীক্ষায় ব্যস্ত। মেলোটাউনে মানুষগুলোকে কে মারলো। জীবাণু, ভাইরাস না কোনো গ্যাস। কয়েকটি জীবিত ইঁদুরের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করে জানা গেল কোনো অজানা জীবাণু তাদের মেরেছে।

সেই জীবাণু সর্বপ্রথমে ফুসফুসকে আক্রমণ করে শরীরের সমস্ত রক্ত সেকেণ্ডের মধ্যে জমাট করে দিয়ে মানুষগুলোকে মেরে ফেলেছে। কি সাংঘাতিক। এমন কিছু জীবাণু যদি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কি পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ বা জীব বেঁচে থাকবে?

গ্যারি হাস্টন আর একটা পরীক্ষা করলো। হেপারিন নামে একটা ভেষজ আছে। হেপারিন ইঞ্জেকশন দিলে রক্ত জমাট বাঁধে না। সে কয়েকটা ইঁদুরের দেহে বিভিন্ন শক্তির হেপারিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দেখলো যে সেগুলি এক সেকেণ্ড থেকে তিন মিনিটের মধ্যে মারা গেল। যেটির দেহে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হেপারিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। সেটি মরতে তিন মিনিট সময় লাগলো।

গ্যারি হাস্টনের উচিত ছিল এই ইঁদুরগুলির অর্থাৎ যাদের হেপারিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল সেগুলির দেহ চিরে দেখা। কিন্তু সে তা করলো না। করলে ভাল করতো।

সে অন্য ইঁদুরগুলি এবং একটি বানরের মৃতদেহ চিরে দেখতে আরম্ভ করলো। পরীক্ষা করে দেখলো সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। হার্ট, লাংস, লিভার, কিডনি, প্লীহা প্রভৃতি অঙ্গগুলি যেন শক্ত পাথর হয়ে গেছে।

দশ ঘণ্টা ধরে গ্যারি হাস্টন নানা রকম পরীক্ষা করে সে সাব্যস্ত করলো যে কোনো অজ্ঞাতনামা জীবাণু মানুষগুলিকে মেরেছে। সেই জীবাণু বায়ু বাহিত, আকার এক মাইক্রনের বেশি বড় নয়, অতএব গ্যাস কণিকা, ভাইরাস, কোনো প্রোটিন কণিকা বা যে-কোনো বস্তুর অণু অপেক্ষা বড়। একটি জীবকোষ এত বড়ই হয় এবং জীবাণুটি একটি জীবকোষ হতে পারে। মৃত জীবাণু সংক্রামক নয়। এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে প্রথমেই ফুসফুস আক্রমণ করে এবং যেভাবেই হোক শরীরের সমস্ত রক্ত অতি দ্রুত জমাট করে দেয়। রক্ত জমাট বাঁধে না এমন

ভেষজ প্রয়োগ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।
গ্যারি-সাব্যস্ত করল যে এমন কিছু আছে যার কাছে এই জীবাণুদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, নইলে দু'টো প্রাণ রক্ষা পেল কি করে?

হেজার ডেভিস এবং বেবিকে পরীক্ষা করে কি ফল পাওয়া গেল জানবার জন্যে ডঃ ইয়ং কমপিউটরের সামনে বসলো।
বেবির কোনো ঝামেলা নেই, তার সবই স্বাভাবিক। বেবিকে কিছু প্রশ্ন কবতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তা সম্ভব নয়।
হেজার ডেভিসের শারীরিক সকল ক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। কমপিউটর একটা যন্ত্র। অনেক কিছু বলতে পারলেও সব কিছু বলতে পারে না। তাই হেজার ডেভিসকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু সে তো আচ্ছন্ন। প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে কি?
প্লাস্টিক স্যুট পরে উইলিয়ম ইয়ং হেজার ডেভিসেব শর্যাপার্শ্বে গিয়ে তার মুখের ওপব ঝুঁকে ডাকলো।
মিঃ ডেভিস, উঠুন···
কয়েকবার ডাকবার পর হেজার ডেভিস আস্তে আস্তে চোখ খুললো। স্বভাবতই চোখে বিস্ময়, ও কে? পরণে এমন পোশাক কেন?
শান্ত স্বরে ডঃ ইয়ং বললো, ভয় পেয়ো না, তুমি খুব অসুস্থ, আমরা তোমাকে সারিয়ে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তুমি কি একটু ভালো বোধ করছো?
হেজার ভয় পেয়েছে। সে ঢোঁক গিললো। কথা বলতে ভয় পাচ্ছে তবে তার ত্বকের বিবর্ণ ভাব কেটে গেছে, রক্ত ও প্লাজমা দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে, গাল ও নখের রঙের উন্নতি হয়েছে। ডঃ ইয়ং আবাব জিজ্ঞাসা করলো, এখন কেমন মনে হচ্ছে?
ভাল···তুমি কে?
আমার নাম ডঃ উইলিয়ম কিং, আমি তোমার চিকিৎসা করছি, তোমার খুব ব্লিডিং হচ্ছিলো, আমরা রক্ত দিয়েছি।

হেজার ডেভিস ডাক্তারের কথা বুঝতে পারলো। চোখে বুঝি কৃতজ্ঞতার আভাস। ডঃ ইয়ং আবার জিজ্ঞাসা করলো।

এরকম ব্লিডিং তোমার আগে হয়েছিল ?

হয়েছিল, দু'বার, আমি কোথায় ? এটা কি হাসপাতাল ? তুমি ওরকম একটা অদ্ভুত পোশাক পরেছ কেন ?

এটা হাসপাতাল নয়, নেভাডা স্টেটে এটা একটা স্পেশাল ল্যাবরেটরি।

নেভাডা ? আমি তো অ্যারিজোনায় ছিলুম।

তা ছিলে, আমরা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তুমি মেলোটাউনে ছিলে, সেখানে একটা মড়ক লেগেছিল, সংক্রামক ব্যাধি, সেজন্যে আমাকে এবং এখানে আরও কয়েকজনকে এই পোশাক পরতে হয়েছে, ছোঁয়াছুয়ি বাঁচিয়ে তোমাকেও আলাদা করে রাখা হয়েছে।

তাহলে আমি কি ছোঁয়াচে ?

তা আমরা এখনও বলতে পারছি না, তবে···

শোনো ছোকরা আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, আমাকে ছেড়ে দাও, একটা সিগারেট দাও আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

হেজার ডেভিস উঠে বসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাকে খাটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। সে উঠতে পারলো না। তখন বিরক্ত হয়ে বললো, কৈ সিগারেট দিলে না ?

সরি, এই বাড়িতে একটাও সিগারেট নেই, থাকলেও তোমাকে দিতুম না, ডঃ ইয়ং বললো।

ঐ তো তোমাদের ডাক্তারদের দোষ। আমার বোন আর ন্যাকা ভগ্নি-পতি আমাকে জোর করে ফিনিক্স শহরে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। ডাক্তাররা বললো, এ খেয়ো না, সে খেয়ো না, সিগারেট খেয়ো না মদ খেয়ো না।

এটা কবে হয়েছিল ? হাসপাতালে কেন গিয়েছিলে ?

গত বছর, আমার পেটের জন্যে, কিন্তু ডাক্তার কি করলো, আমার পেট যেমনকার তেমনি আছে, হেঁচকি উঠলে ব্লিডিং হয়।

তুমি বোধহয় ডাক্তারদের কথা শোনো নি।

শুনে কি হবে ? ঢের দিন বেঁচেছি, তা বলে না খেয়ে মরব নাকি ? পেটে ব্যথা হলে অ্যাসপিরিন খাই, রোজ এক টিউব, তা গোটা দশ খাই তার-ওপর স্টানো যাই, সিগারেট তো আছেই।

সে কি, তুমি এসব খাও ?

আমাকে আরও একবার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, ডাক্তাররা বললো পেট কাটবে, আমি বললুম, ঢের হয়েছে, সত্তরটা বছর তো এই পেট নিয়ে কাটালুম··· ।

তুমি ভুল করেছ।

দেখ বাপু লেকচার দিও না, খালি দুধ খেয়ে থাকা যায় নাকি ? আমি আমার নিজের চিকিৎসায় ভাল আছি তবে আজকাল নিশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হয়, ও এ বয়সে হবেই, এখন তুমি যাও তো আমার ঘুম পাচ্ছে।

উইলিয়ম ইয়ং আর অপেক্ষা করলো না। সহকারীকে নির্দেশ দিল বৃদ্ধকে আরও এক বোতল রক্ত দিতে।

বারোটার ঘণ্টা বাজলো। এবার একটা মিটিং আছে। উইলিয়ম তার প্লাস্টিক স্যুট ছেড়ে রাখলো।

মিটিং রুমে এসে উইলিয়ম দেখল সকলে এসে গেছে। চেয়ারে বসতে বসতে সে শুনতে পেল ডঃ মারকাস বলছেন, আমরা গ্যারির বক্তব্য আগে শুনবো।

গ্যারি হাস্টন বললো, তার বিশ্বাসের মূলে একটা জীবাণু আছে, সেটা এক মাইক্রনের চেয়েও বড় হবে না।

এই কথা শুনে ডঃ মারকাস এবং স্যাম চেসার মুখ চাওয়াচায়ি করলো। তারা যে সবুজ ছাপ দেখেছে তা আরও বড়ো তবে এক মাইক্রন মাপের জীবাণু যে-কোনো প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে।

স্যাম চেসার কয়েকটা ইঁদুরের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সে কথা বললো। তার বিশ্বাস সেই মারাত্মক জীবাণু বাতাসে ভেসে আসে, প্রথমে ফুসফুস আক্রমণ করে শরীরের সমস্ত রক্ত

জমিয়ে দেয়, তবে কিভাবে জমায় তা সে বলতে পারে না, সেজন্যে আরও গবেষণার দরকার। এই জীবাণুর আক্রমণে মৃত জীব রোগ সংক্রমণ করতে পারে না। এর প্রমাণ মেলোটাউনেও পাওয়া গিয়েছিল, শকুনির দল মৃত ব্যক্তিদের দেহ খেতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তারা মরে নি। পরে তাদের গ্যাস ছড়িয়ে মারতে হয়েছিল।

গ্যারি হাস্টনের বক্তব্য শেষ হতে ডঃ মারকাস উইলিয়ম ইয়ংকে বললেন, বেবি আর বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে তুমি কি পেলে বল বিল।

বিল অর্থাৎ উইলিয়ম ইয়ং বললো, বেবি তো স্বাভাবিক, তার কোনো কমপ্লেন নেই আর বৃদ্ধ হেজার ডেভিস রীতিমতো অসুস্থ, পেটে আলসার যা থেকে ব্লিডিং হয়, তাকে ব্লাড ও প্লাজমা দেওয়া হচ্ছে। হেজার ডেভিসের বয়স সত্তর, খিটখিটে, গত দু'বছর হলো তার আলসারে ব্লিডিং হচ্ছে। ডাক্তারদের কোনো কথা শোনে না, শুনতে চায়ও না। নিজের চিকিৎসা নিজেই করে, রোজ দশটা অ্যাসপিরিন খায়, স্টানৌ খায়। নিশ্বাসের কষ্ট আছে।

গ্যারি হাস্টন মন্তব্য করলো, তার মানে তার পেটটি একটি অ্যাসিডের কারখানা। স্টানৌতে অ্যালকোহল আছে আর আছে মিথানল। শরীরের ভেতর মিথানল ঢুকে ভেঙে ফরমালডিহাইড এবং ফরমিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় তার ওপর আছে অ্যাসপিরিন। বুড়ো পেটের মধ্যে প্রচুর অ্যাসিড তৈরি করছে। পেটের মধ্যে অ্যাসিডের চাপ কমিয়ে রাখতে না পারলে মৃত্যু। পেটে অ্যাসিড ও ক্ষার পদার্থের ভারসাম্য রাখতে হলে শরীর ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকবে, কারবন ডাই-অকসাইড বার করে দিতে হবে, তবে শরীরের ভেতরে কারবনিক অ্যাসিড কমতে থাকবে। তবে এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়!

ডঃ মারকাস প্রশ্ন করলেন, হেজার ডেভিসের পেটের মধ্যে এই অ্যাসিড কি তাকে ঐ মারাত্মক জীবাণু থেকে রক্ষা করেছে?

উইলিয়ম বললো, বলা যাচ্ছে না কারণ বেবি তো বেঁচে আছে। তার পেটে অ্যাসিডের পরিমাণ তো স্বাভাবিক।

ডঃ মারকাস বললো, তাহলে হেজার ডেভিস এবং বেবির শরীরে এমন

কিছু আছে যা ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেইটে যে কি তা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

এবার গ্যারি হাস্টন ডঃ ইয়ংকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা হাইড্রার মধ্যে কি পেলে তা আমাদের এবার বল।

বলা অপেক্ষা আমরা কিছু দেখাবো। আমরা মুভি ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে রেখেছি। তোমাদের দেখাচ্ছি। আমরাও বিশ্বাস করছি মূলে একটা সাংঘাতিক জীবাণু আছে। তবে ছবি তো এ ঘরে দেখানো যাবে না, অন্য ঘরে যেতে হবে, চলো।

সকলে যে ঘরে এসে বসলো সে ঘরে ছবি দেখাবার সব ব্যবস্থাই ছিল। সকলে বসার পর স্যাম চেসার আলো নিবিয়ে প্রজেক্টর চালু করলো।

প্রথমে বালুকণার মতো ক্ষুদে দানাটি। সেটি এখন বড় করে দেখানো হচ্ছে। গায়ে কালো ও সবুজ ছাপ।

এরপর সবুজ ছাপ। সবুজ ছাপ খুব ধীরে আকৃতি পরিবর্তন করলো। অবশ্য তার কোনো বিশেষ আকৃতি ছিল না, কিন্তু এলোমেলো বক্র রেখার সমন্বয়ে তার যে আকৃতি ছিল তার যেন কিছু পরিবর্তন হলো। তারপর বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো সবুজ রং বদলে লালচে বেগুনি হলো এবং সে রং বদলে আবার সবুজ হলো।

একজন বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলো, ডঃ মারকাস তুমি কি মনে করছো যে এই সবুজ ছাপ কোনো ব্যাকটিরিয়ার কলোনি ?

তা আমি এখন বলতে পারছি না, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা না করে আমি কিছু বলতে পারছি না তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে ঐ সবুজ ছাপের মধ্যে ব্যাকটিরিয়াগুলি সম্ভবতঃ ত্রিকোণ, ট্র্যাঙ্গু-লার।

ট্র্যাঙ্গুলার? বল কি মারকাস? ট্র্যাঙ্গুলার ব্যাকটিরিয়া তো আমরা ভাবতেই পারি না।

হেকসাগোনালও হতে পারে, মারকাস বললেন।

আর হেঁয়ালি সৃষ্টি করো না মারকাস।

বললুম তো ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা না করে তোমাদের

সঠিক কিছু বলতে পারছি না, এইবার দেখ।

পর্দায় দেখা গেল যান্ত্রিক হাত সূক্ষ্ম সূচের সাহায্যে একটু সবুজ ছাপ পৃথক করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট অংশটুকু রং বদলে লালচে বেগুনি হয়ে গেল!

এরপর ছবি শেষ। সেদিনে মিটিংও শেষ।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ডঃ মারকাস বললেন, ঐ ব্যাকটিরিয়া যে অত্যন্ত সাংঘাতিক তা বলাই বাহুল্য, যে সামান্য অংশটুকু আমাদের পৃথিবীতে পড়েছে তাই মুহূর্ত মধ্যে পঞ্চাশজন মানুষ মেরে ফেলছে। আমাদের কাছে যেটুকু আছে সেটুকু যদি এই ইনস্টিটিউটের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে পৌঁছায় তাহলে যে কি বিভীষিকা সৃষ্টি করবে তা আমি ভাবতেই পারছি না। সেজন্যে আমরা যতদূর সম্ভব কঠোর সতর্কতা মেনে চলছি।

আর্থার ওয়ালেস ডিনার শেষ করে বসবার ঘরে গিয়ে একটি সিগার ধরিয়ে সবে খবরের কাগজখানি নিয়ে বসেছে এমন সময় টেলিফোনে একটা খারাপ খবর এল।

ভ্যাণ্ডেনবার্গ এয়ার বেস থেকে জনৈক কর্নেল সলোমন জানাচ্ছে যে স্যান ফ্রানসিসকো থেকে টোপেকা যাবার পথে ইউটা স্টেটে বিগ হেড নামে জায়গায় একটা ফ্যানটম প্লেন ভেঙে পড়েছে। এমন খবর খারাপ হলেও নতুন কিছু নয়। প্লেনটা কোথায়, ক'টার সময় ভেঙে পড়েছে সেটা জেনে নিয়ে আর্থার ওয়ালেস বললো, আমি ঘটনাস্থলে যাব।

প্লেন ভেঙে যাওয়ার নতুনত্ব না থাকলেও এই খবরে একটা বিশেষত্ব ছিল, প্লেনখানা মেলোটাউনের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল।

প্লেনখানা ভেঙে পড়ার আগে তেইশ হাজার ফুট ওপর থেকে গডার্ড স্পেসফ্লাইট সেণ্টারের সঙ্গে রেডিও মারফত নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়েছিল।

পাইলট বলেছিল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে···রবারের এয়ার হোস গলে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ কাঁপুনির জন্যে এরকম হচ্ছে···রবার হোসটা

গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

পনেরো সেকেণ্ড পরে দুর্বল কণ্ঠে পাইলট বললো, ককপিটে রবারের তৈরি সবকিছু গলে যাচ্ছে।

এরপর আর কিছু শোনা যায় নি কারণ কিছু পরেই প্লেনটা ভেঙে পড়েছিল।

মেলোটাউনের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়াও আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। ধ্বংসাবশেষে একটি মাত্র হাড় পাওয়া গিয়েছিল। হাড়টি মানুষেব হাড় বলে সনাক্ত করা গিয়েছিল। ঐ হাড়টি ব্যতীত মৃতদেহের আর কিছু পাওয়া যায় নি। হাড়েব গায়ে মাংস লেগে ছিল না, বেশ পরিষ্কাব।

আর্থার ওয়ালেসের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের আর্থার ওয়ালেস বলেছিল যে এই প্লেনে রবাবের কিছু ব্যবহার করা হয় নি, যা করা হয়েছে তা রবারের মতো একরকম প্লাস্টিক। আকাশে আরও ফ্যান্টম উড়ছে, কোনোটাতেই রবারের কিছু নেই, সবই ঐ প্লাস্টিক। তাহলে এই একটা মাত্র ফ্যানটমে এমন দু'র্ঘটনা ঘটলো কেন?

আর্থার ওয়ালেস চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নয়। একটা ফ্যান্টম বিমানে প্লাস্টিকের সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল কেন সে কারণটা জানা দরকার। আর অনেক ফ্যান্টম বিমানে ঐ একই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ফলে অনেক বিমান ধ্বংস ও অনেক মানুষের মৃত্যু।

ধ্বংসাবশিষ্ট থেকে আর্থার ওয়ালেস নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের কিছু নমুনা নিয়ে ফিবে এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে দিল।

কেমিস্টরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিল। সারা রাত্রি ধরে কাজ চললো। আর্থার ওয়ালেস ফল জানবার জন্যে ল্যাবরেটবিতে বসে রইলো, বাড়ি ফিরলো না।

সকালে ফল জানা গেল। একজন বায়োকেমিস্ট বললো, কোনো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা প্রচণ্ড তাপে ফ্যানটমের প্ল্যাস্টিক গলে গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু সেরকম কোনো ঘটনা ঘটার সুযোগ ঐ বিশেষ বিমানে ছিল

না।

তাহলে ফ্যানটমের সমস্ত প্ল্যাস্টিক কিসে গলে গেল? আর্থার ওয়ালেস প্রশ্ন করলো।

কোনো ব্যাকটিরিয়া এই কাজ করে থাকতে পারে?

ব্যাকটিরিয়া কোথা থেকে আসবে?

তা আমরা বলতে পারি না, বায়োকেমিস্ট বললো।

আর্থার ওয়ালেসের মনে পড়লো ডঃ নরম্যান মারকাসের কথা। বায়োকেমিস্টকে ওয়ালেস কিছু বললো না। ব্যাকটিরিয়া কোথা থেকে এল এই প্রশ্নের জবাব নরম্যান দিতে পারে। নরম্যান কি নিয়ে কাজ করছে তা আর্থার ওয়ালেসের জানা আছে। ফ্যানটম প্লেন ক্র্যাশের খবরটা নরম্যানকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

আর্থার ওয়ালেস ডঃ মারকাসকে ফোন করতে যাবে এমন সময়ে টেলিপ্রিণ্টার মারফত আরও একটা মৃত্যুর খবর এল। মেলোটাউনের চারদিকে যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে ডেনিস রজার্স নামে একজন সিকিউরিটি অফিসার অকস্মাৎ মারা গেছে।

হাইড্রা ক্যাপস্যুলটির গায়ে যে সবুজ ছাপ পাওয়া গেছে এবং তা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তা খানিকটা এগিয়েছে। একটা মাইক্রোঅর্গাজিম অর্থাৎ জীবাণু পাওয়া গেছে। এমন জীবাণু পৃথিবীতে আগে কখনও কোথাও দেখা যায় নি। জীবাণুগুলি ত্রিকোণ এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার যে এগুলিতে কোনো প্রোটিন নেই এবং প্রতি কোষে নেই কোষকেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াস ছাড়া জীবাণু পৃথিবীতে দু'একটা দেখা গেলেও প্রোটিন ছাড়া জীবাণু কল্পনা করা যায় না অথবা এই ত্রিকোণ জীবাণুগুলির মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য জীবাণুর মতো কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পাওয়া গেছে, পাওয়া যায় নি কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিন।

জীবাণুগুলি ত্রিকোণ এবং প্রাণঘাতী তাই এদের একটা কোডনেম

দেওয়া হয়েছে, 'ডেভিল ট্র্যাঙ্গল'।

পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এখনও এদের পরীক্ষা করা হয় নি। সে পরীক্ষাটা ডঃ মারকাস নিজে করবেন। তার তোড়জোড় চলছে।

কেমন আছ মিঃ ডেভিস? উইলিয়ম ইয়ং জিজ্ঞাসা করলো।

হেজার ডেভিস কয়েকবার চোখ পিট পিট করে প্ল্যাস্টিক স্যুট পরিহিত উইলিয়ম ইয়ংকে একবার দেখে নিয়ে বললো।

অলরাইট তবে খুব ভাল নয়, তবুও অলরাইট। হেজার ডেভিস একটু হাসলো। হাসি দেখে উইলিয়ম বুঝলো বুড়োর মেজাজ ভাল আছে, খিটখিটে ভাবটা নেই, কথা বলবে।

তাহলে মিঃ ডেভিস কিছুক্ষণ গল্প করা যাক, কি বল?

কি গল্প করবে?

এই ধরো মেলোটাউনের বিষয়।

মেলোটাউন নিয়ে?

হ্যাঁ, সেদিনের মানে সেই রাত্রে কি ঘটেছিল? তুমি তো বরাবর মেলো-টাউনেই থাকতে?

হ্যাঁ, সারা জীবনটাই তো ওখানে কাটালুম, কিন্তু তোমাদের মেলো-টাউনের বয়স আর কত? যাই হোক মেলোটাউন হয়ে ইস্তক ওখানেই আছি। ওখান থেকে লস এঞ্জেলস, স্যান ফ্রানসিসকো, সেণ্ট লুই গিয়ে-ছিলুম। বার দুই ফিনিক্স-এ গিয়েছিলুম।

উইলিয়ম ভাবলো বুড়ো অন্য শহরের কথা বলতে আরম্ভ করলে সহজে থামবে না, তাই বললো।

তুমি বরঞ্চ ঐ রাত্রির কথা বল।

ঐ রাত্রির কথা? হেজার ডেভিস একটু থেমে বললো, কেন বাপু, ঐ বিভীষিকা রাত্রির কথা আবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছ?

না না তুমি বল, বিভীষিকা আবার কি? অমন তো কত লোক হঠাৎ মরে যায়, এই তো সেবার ড্যাম ভেঙে দুটো গ্রামের লোক শেষ হয়ে

গেল, তুমি বলো।

মেলোটাউনের সবাই কি মরে গেছে ?

কি করে হবে ? তুমি আর ঐ বাচ্ছাটা ছাড়া।

বাচ্ছা ? কোথায় ?

ঐ তো তোমার পাশে বেবিকটে ?

ও ! ঐ বাচ্ছাটা ? ও তো ল্যারির বেবি একেবারেই শিশু, তাই না ?

দু'মাস আন্দাজ বয়স হবে।

হ্যাঁ ঐ রকমই হবে। ওর মা আর বাবা ভীষণ চিৎকার করে ঝগড়া করে আর বাচ্ছাটাও সমানে চিৎকার করে, এত জোর চেঁচামেচি হয় যে, আমি তো জানালা খুলে রাখতে পারতুম না।

ল্যারি অ্যাটকিনসনের বিষয় কিছু বলতে পার ?

ল্যারি আর ওর বৌ লরা দু'জনেই বেশ হেলদি, সবসময়ে কাজ করছে কিন্তু হাতও যত চলছে মুখও তত চলছে, চিৎকার করে সে কি ঝগড়া, বেবিটাও তেমনি হয়েছে, সবসময়ে কান্না, ঐ দিন রাতেও কাঁদছিল।

কোন্ রাত্রে ?

যে রাত্রে ডাডলি পোপ ঐ মৃত্যুবানটা নিয়ে এল। আমরা সকলেই ওটা দেখেছি। আকাশ থেকে যেমন তারা খসে পড়ে ? ওটাও তেমনিভাবে জ্বলতে জ্বলতে উত্তর দিকে পড়লো। আমরা তো অবাক, কেউ ভয়ে জড়োসড়ো কিন্তু ডাডলির সাহস খুব বেশি, ডাডলি পোপ ওটা তুলে আনলো। ওর একটা নতুন ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন আছে, সেই স্টেশন ওয়াগনে ওটা চাপিয়ে মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এল।

উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কি হলো ?

ডাডলি ওটা গাড়ি থেকে নামাতে আমরা সকলে ঘিরে দেখতে লাগলুম, অ্যানি বললো, ওটা মার্স থেকে এসেছে, ও সবজান্তা কিন্তু আমরা বললুম মার্স থেকে আসবে কেন ? কেপ ক্যানভেরাল জান তো? যেখান থেকে চাঁদে রকেট পাঠায় ? আমরা বললুম ওটা সেই কেপ ক্যানাভেরাল থেকে আকাশে ছাড়া হয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এসেছে।

তারপর কি হলো বল।

আমরা সকলে বলাবলি করতে লাগলুম ওটা নিয়ে কি করবো ? আমরা বাপু ঝামেলা পছন্দ করি না। একবার কোথা থেকে মস্ত একটা রেড ইণ্ডিয়ান আর তার বৌ এসে খুব ঝামেলা করেছিল।

ও কথা থাক, তোমরা ক্যাপস্যুলটা নিয়ে কি করলে তাই বল।

তোমরা বুঝি ওকে ক্যাপস্যুল বল ? জেমি বললো ওটা খুলে ফেলা যাক কিন্তু আর একজন বললো, খুলবে কেন ? ওটা সায়েন্টিস্টরা পাঠিয়েছে, ওর ভেতরে এমন কিছু আছে যা আমাদের খোলা উচিত হবে না। ডাডলি বললো, আমরা ডঃ টুচম্যানের কাছে নিয়ে যাই হেনরি টুচম্যান আমাদেব মেলোটাউনের ডাক্তার, আমাদের সকলের চিকিৎসা করে, অনেক পড়াশোনা করে, ওকেই দিয়ে আমি যা ভাল বুঝবো করাবো। তাই আমরা তখন ঐটে ডাক্তারেব বাড়িতে নিয়ে গেলুম।

বেশ, তারপর ?

ডাক্তার তো ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারপর আমাদের অনেক প্রশ্ন করলো আর শেষে যেমন কবে ডাক্তার রোগী দেখে সেইভাবে, তুমি কি বললে ? ক্যাপস্যুল ?

হ্যাঁ, ক্যাপস্যুলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আমাদের বললো, এটা মার্স থেকে আসে নি, কোনো রকেট স্টেশন থেকে এটা ছাড়া হয়েছিল। তারপর ডাক্তার বললো, ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে দেখছি ওটার কোনো হদিস করা যায় কি না। আমাদেরও খাবার সময় হয়ে এসেছিল, ডাক্তারও তাশ খেলতে যাবে, তাই আমরা তখন চলে এলুম।

তখন কটা বেজেছিল ?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হবে।

টুচম্যান ডাক্তার ক্যাপস্যুলটা নিয়ে কি করলো ?

ডাক্তার তো সেটা নিয়ে ঘরে ঢুকলো, আমরা পবে আর সেটাকে দেখি নি। কাণ্ডটা আরম্ভ হলো আটটা নাগাদ, বুঝলে। আমি পেট্রল পাম্পে জনির সঙ্গে একটু খোস গল্প করছিলুম। সেদিন জনিব নাইট ডিউটি ছিল। বেশ ঠাণ্ডা, আমার পেট ব্যথা করছিল। যন্ত্রণা ভোলবার জন্যে ঐ শীতেও বেরিয়েছিলুম আর এই সুযোগে কোথাও একটু সোডা ওয়া-

টার খাবো, জান তো আমি অ্যাসপিরিন খাই, সেজন্যে অ্যাসপিরিনের অ্যাসিড নষ্ট করতে ঐ সোডা খাওয়া আর কি। আরও একটা মতলব ছিল। গলাটা শুকনো মনে হচ্ছিল একটু স্টার্নও পান করা যাবে।

সেদিন আগে কি তুমি স্টার্নো খেয়েছিলে ?

হ্যাঁ, দু'টো নাগাদ খানিকটা খেয়েছিলুম বইকি।

খারাপ কি ? জনির সঙ্গে যখন কথা বলছিলুম তখন একটু ঝিম ঝিম ভাব থাকলে আর পেটটা ব্যথা করলেও ভালোই লাগছিল। আমরা দু'জনে দোকানঘরের ভেতরে বসেছিলুম, বেশ কথা বলছিলুম। জনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমার মাথা, ওরে বাপরে, মাথা গেল রে, বলতে বলতে সে দু'হাতে মাথা ধরে লাফালাফি কবতে করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে গেল, আর উঠলো না। কত ডাকাডাকি করলুম, কোনো সাড়া নেই।

হেজার ডেভিস কথা বলতে বলতে উইলিয়মের মুখের দিকে চেয়ে বললো, একটা সিগারেট দেবে ?

আমাদের এই বাড়িতে সিগারেট ঢোকা নিষেধ। সিগারেট পাবে না। এই পিলটা খেতে পার, সিগারেট টানার ইচ্ছে চলে যাবে।

তাইই দাও।

উইলিয়ম পকেট থেকে বাব করে তাকে ছোট্ট একটা পিল দিল। ডেভিড গিলে ফেললো। তাবপর আবার আরম্ভ করলো, কি যে হলো আমি বুঝতেই পারলুম না। প্রথমে ভেবেছিলুম হার্ট অ্যাটাক কিন্তু এত কম বয়সে ? আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম। মিসেস নোরা লফট, এডুইন লফটের বিধবা বেরিয়ে পড়েছে, তারপর আরও অনেকে বেরিয়ে পড়লো, কেন বেরোচ্ছে বুঝতে পারছি না, আমি কি রকম হয়ে গেছি। সকলেই দেখি বুক চেপে ধরছে আর পড়ে যাচ্ছে আর উঠছে না, কথাও বলছে না।

তখন তোমার কি মনে হচ্ছিল ? উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো।

আমার কথা বলছো ? আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম, চোখের সামনে মানুষগুলো মরে যাচ্ছে এবং আমিও যে-কোনো মুহূর্তে মরে যেতে

পারি। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি যা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কোনো শব্দ নেই শুধু এই বেবিটার কান্না। পায়ের আওয়াজ পেলুম, মুখ তুলে দেখি জেনারেল তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে

জেনারেল কে ?

আসলে, জেনারেল নয়, ও যুদ্ধে গিয়েছিল তাই আমরা ওকে জেনারেল বলে ডাকতুম। দেখি কি ও যুদ্ধের ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হচ্ছে হে হেজার, নিশ্চয় জাপানীরা আসছে। আমি বলি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রোনাল্ড হার্ডি। মাথা ওর সত্যিই খারাপ হয়েছিল নইলে নিজেকে গুলি করলো কেন ? কোনো একটা মড়ক লেগেছিল নইলে এতো লোকের মাথা খারাপ হবে কেন ?

কি করে জানলে মাথা খারাপ হয়েছিল ?

নিশ্চয়, নইলে যারা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক ছিল তারা কেউ নিজের পোশাকে আগুন লাগিয়ে দিল, কেউ জলে ডুবলো, কেউ গুলি করলো কেন ?

তুমি কি করলে ?

আমি নিজেকে বললুম, হেজার ডেভিস তুমি স্বপ্ন দেখছ, তুমি আজ বেশি মদ খেয়েছ। আমি তখন বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লুম। ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ঘুম আর আসে না। রাত্রি দশটা আন্দাজ সময়ে বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলুম। বাইবে বেরিয়ে এলুম। একটা ভ্যান থামলো, ভেতরে দু'জন লোক কিন্তু তারা তখনও বেঁচে আছে অথচ বাইরে সবাই মরে গেছে। এই ভ্যানের আর একটা গাড়ি এসেছিল অথচ রাত্রে মিলিটারি নয়তো সিকিউরিটির অনেক গাড়ি যাওয়া-আসা করে।

আর একটা গাড়ি ? কার গাড়ি ? কে ছিল জান ?

জানি, ডেনিসের গাড়ি, ডেনিস রজার। সিকিউরিটি অফিসার। মরণ-খেলা আরম্ভ হবার পঁচিশ তিরিশ বা আরও কিছু আগে সে মেলো-টাউনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে কিন্তু থামে নি। আজ আর কথা বলতে পারছি না, তুমি কিছু মনে কোরো না, যদি কেটে

পড় তো একটু ঘুমোই।

উইলিয়ম ইয়ং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁচের পার্টিশন দিয়ে হেজার ডেভিস ও বেবিকে কিছুক্ষণ ধরে দেখলো।

হেজার ডেভিসের সঙ্গে কথা শেষ করে উইলিয়ম ইয়ং গ্যারি হাস্টনের ঘরে গেল। যেসব ইঁদুরগুলিকে গ্যারি চিরে দেখেছিল এখন সে তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের টিস্যু তুলে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল রক্ত কি করে জমাট বাঁধলো তার কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না সেটা জানা এবং ঐ অজানা জীবাণু ডেভিল ট্র্যাঙ্গেলে কোথাও প্রবেশ করেছে কি না।

উইলিয়ম ইয়ং গ্যারির কাঁধের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো, কিছু পেলে?

না হে, কিছুই পাচ্ছি না, কয়েকটা মানুষ মরবার আগে পাগল হয়ে গেল কি করে? অবশ্য এদের মধ্যে কয়েকজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ হলে শরীরের অনেক কিছু কমজোরী হয়ে যায়, হার্ট, লাংস, লিভার ইত্যাদিতে গোলমাল দেখা দেয়, স্মরণশক্তি কমে যায়, ভীমরতি দেখা দেয়, সবই মানছি, কিন্তু একই সঙ্গে এতগুলো মাথা খারাপ হলো কিসে?

উইলিয়ম ইয়ং বললো, হেজার ডেভিস বলেছে পেট্রল পাম্পের জনি 'আমার মাথা, আমার মাথা' বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই মারা যায়।

গ্যারি প্রশ্ন করলো, ঠিক মরবার আগে?

তুমি কি মনে কর জনির মাথায় হেমারেজ হয়েছিল?

বলতে পারি না, সেটা দেখতে হবে, গ্যারি বললো।

কিন্তু গ্যারি আমরা তো দেখেছি ফুসফুস থেকে আরম্ভ করে সারা শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে মানুষগুলো মারা গেছে।

বিল সব ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয় নি, কেউ আরও কিছুক্ষণ বেঁচেছিল এবং তাদেরই মাথায় বিকার দেখা দিয়েছিল।

গ্যারি হাস্টন কয়েকটা ইঁদুরের মস্তিষ্কের টিস্যুতে সবুজ ছাপ অর্থাৎ

ডেভিল ট্র্যাঙ্গেলের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিল। যাদের হার্ট, লাংস বা লিভার ইত্যাদির টিস্যুতে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া বা ডেভিল ট্র্যাঙ্গল জীবাণু দেখা গিয়েছিল তাদের ব্রেন টিস্যুতে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া দেখা যায়নি। তাহলে কি এদের রক্তে এমন কিছু ছিল যার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধে নি এবং জীবাণু মস্তিষ্কে পৌছবার পর তবে রক্ত জমে গিয়েছিল ?

এই সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

রক্ত জমাট বাঁধবে না এমন কোনো ভেষজ কয়েকটা ইঁদুরের দেহে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো মরে গিয়েছিল কিন্তু তাদের দেহ চিরে দেখা হয় নি। গ্যারি হাস্টন সেগুলি কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিল। এখন সেগুলি বার করে মাথাগুলো চিরে দেখলো। প্রতিটিতে হেমারেজের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তাতে কি হলো ? হেজার ডেভিস ও বেবিকে কিছুই স্পর্শ করলো না কেন। একজন বৃদ্ধ অপরজন শিশু, এই দু'জনের মধ্যে কি আছে যা তাদের মারতে পারলো না ?

ডঃ মারকাস লক্ষ্য করলেন যে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন মিডিয়াতে বংশ বৃদ্ধি করেছে যেমন চিনি, রক্ত, চকোলেট, আগার বা শুধু কাঁচের ওপরেও একই ভাবে বংশ বৃদ্ধি করছে। প্রশ্ন হলো বিভিন্ন মিডিয়াতে বংশ বৃদ্ধি করলেও এদের চরিত্র বজায় আছে কি না। ইলেকট্রন মাই-ক্রোস্কোপে তা ধরা পড়বে।

আলট্রা-ভায়োলেট রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে বংশবৃদ্ধি দ্রুত হচ্ছে। ইনফ্রা-রেড রশ্মি, অক্সিজেন প্রয়োগ করে দেখা গেছে বৃদ্ধিহার কমে গেছে, অন্ধকারেও তাই। নাইট্রোজেন কোনো তারতম্য ঘটাতে পারে নি। কিন্তু আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োগ করে দেখা গেল বংশবৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হচ্ছে। বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রয়োগে বংশবৃদ্ধির হার সর্বনিম্নে।

ডঃ মারকাস বললেন, আমার মনে হচ্ছে এই ডেভিল ট্র্যাঙ্গল কোনো ভাবে এনার্জি মানে শক্তি উৎপাদন করতে পারে। জীবাণু সম্বন্ধে আমাদের

যে সব ধারণা আছে তার কিছুই মিলছে না।

ডঃ মারকাস বুঝলেন এই জীবাণু নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা বাকি কিন্তু ইতিমধ্যে কড়া নজর রাখতে হবে পৃথিবীর আবহাওয়ায় এদের চরিত্র না বদলে যায়, কায়ার রূপান্তর না ঘটায় মিউটেশন আরম্ভ না হয়ে যায়।

ডঃ মারকাস গ্যারি হাস্টনকে ডাকলেন। গ্যারি বললো তার পরীক্ষা এখনও চলছে। কখন বা কবে শেষ হবে বলতে পারছে না, তবে কমপিউ-টার তাকে সাহায্য করছে। সবে কমপিউটর মারফত ইলেকট্র-এন-সেফালোগ্রাম পরীক্ষা শেষ করলুম। চার্ট তৈরি করেছি কিন্তু ফলাফল এখনি বলতে পারছি না।

ডঃ মারকাস বললেন, আমাদের দৃষ্টি ছিল যাতে এই মারাত্মক জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। সেইদিকে নজর রাখতে গিয়ে কোথাও কোথাও আমাদের ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে।

ওরা দু'জনে স্থির করলো বায়োলজিক্যাল টেস্টিং আবার আরম্ভ করা হোক আর সেই সময়ে একজন টেকনিশিয়ান খবর দিল এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির রিপোর্ট প্রস্তুত।

বায়োলজিক্যাল টেস্টিং স্থগিত রেখে ওরা এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির রিপোর্ট নির্ণয় করতে গেল। সেখানে কি দেখা গেল? গ্রীন ব্যাকটিরিয়া ডেভিল ট্র্যাঙ্গেলের কোষগুলি অত্যন্ত সাধারণ অথচ অস্বাভাবিক। জীবাণুর কোষে যা দেখা যায় যেমন নিউক্লিয়াস, মিটোকনড্রিয়া এবং রাইবোসোম, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। চটচটে যে পদার্থ দিয়ে সেল গঠিত তাতে প্রোটিন নেই। তাহলে এই অতি সাধারণ জীব-কোষের শক্তির উৎস কোথায়? হয়তো এরা সমষ্টিগতভাবে কাজ করতে পারে, এককভাবে নয়।

কোষের ভেতরে যে সবুজ পদার্থটি রয়েছে সেটি প্রোটোপ্লাজম নয়। তার রং সবুজ। সেটি কি পদার্থ? তার মধ্যে কি কার্বন, হাইড্রোজেন, অকসিজেন ও নাইট্রোজেন আছে? প্রথমে তাই অনুমান করা হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অন্য পদার্থ দিয়ে জীবকোষগুলি গঠিত। ত্রিকোণ

কোষগুলি যেখানে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সেখানে চক্রাকার কালো পদার্থ দেখা যাচ্ছে, কোথাও ঘন কোথাও পাতলা। এই কালো চক্রই কি শক্তির উৎস? কোষগুলিকে কি এই কালো চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে? কালো পদার্থ কি দিয়ে গঠিত?

মারকাস ও গ্যারি হাস্টনের মাথায় নানা প্রশ্ন।

ডঃ উইলিয়ম ইয়ং ভীষণ ক্লান্ত। কাজকর্ম স্থগিত রেখে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো। কাপ হাতে নিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। একবার করে কাপে চুমুক দেয় আর দাঁড়িয়ে পড়ে কি ভাবে।

ঘরে কোনো শব্দ নেই, শুধু টেলিপ্রিন্টারের মৃদু খট্ খট্ শব্দ। টেলিপ্রিন্টার মেসিনের সঙ্গে যে কাগজখানা লাগানো আছে এবং যাতে সংবাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপ হচ্ছে, সেই কাগজ বেশ লম্বা হয়ে মেঝেতে পড়ে অনেকটা গড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় এদিকে কেউ নজর দেয় নি।

উইলিয়মের কি মনে হলো সে কাগজখানা তুলে ধরলো এবং এদিক-ওদিক চোখ বোলাতে বোলাতে একটা প্যারাগ্রাফে তার দৃষ্টি আটকে গেল। দৃষ্টি আটকাবার কথা নয়, কিন্তু হেজার ডেভিসের সঙ্গে কথা বলার সময় সে ডেনিস রজারের নামটা না শুনলে বোধহয় ও মোটেই আগ্রহী হতো না।

তার মনে পড়লো হেজার ডেভিস বলেছিল ডেনিস রজার নামে একজন সিকউরিটি অফিসার ঘটনার কয়েক মিনিট আগে মেলোটাউনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল। সে কোথাও থামে নি।

এই ডেনিসের পরে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডেনিসের নাকি পেটে আলসার ছিল, অ্যাসপিরিন খেয়েছিল এবং সুইসাইড করেছিল। খবরে এই কথাই বলছে।

উইলিয়ম কৌতূহলী হয়ে উঠলো। কোথাও যোগসূত্র থাকতে পারে, সেটা খোঁজ করা দরকার। দেখা যাক, অ্যারিজোনা হাইওয়ে পেট্রলের মেডিক্যাল অফিসারের কাছ থেকে কি খবর পাওয়া যায়?

উইলিয়ম তখন টেলিপ্রিন্টারের পাশে রক্ষিত কমপিউটরের কয়েকটা

বোতাম টিপতে পাশে একটা টিভি পর্দায় আলো জ্বলে উঠলো। পর্দায় একটি যুবতীর হাসিমুখ ভেসে উঠলো। তার মাথায় হেডফোন সামনে সুইচবোর্ড।

সে মধুর হেসে জিজ্ঞাসা করলো, কাকে চাই ?

চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে চাই।

দেখছি স্যার।

পর্দার আলো নিভে গেল কিন্তু একটু পরেই আবার পর্দায় সেই যুবতীর মুখ ভেসে উঠলো। যুবতী বললো মেডিক্যাল অফিসার ডঃ জেস উইলার্ডকে এখন পাওয়া যাবে না তবে আপনার কি দরকাব বলুন।

উইলিয়ম বললো সে ডেনিস রজারের মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে চায়।

যুবতী বললো, প্লিজ ওয়েট।

আবাব পর্দার আলো নিভে গেল এবং কিছু পরে পর্দায় টাইপ করা একটা নিউজরিলিজ ভেসে উঠলো। তাতে লেখা আছে :

ব্রাশ রিজ, অ্যারিজোনা। বড় রাস্তায় একটি রেস্তরাঁয় পাঁচজন ব্যক্তিকে একজন হাইওয়ে পেট্রল অফিসার হত্যা করেছে বলে প্রকাশ। ঘটনার একমাত্র সঙ্গী রেস্তরাঁর মিস ন্যানসি হুইলার। সে কোনো রকমে বেঁচে গেছে। ফ্ল্যাগস্টাফ থেকে দশ মাইল দক্ষিণে ১৫ নম্বর রুটে ডাইনইজি ইটিংহোমে ঘটনাটি ঘটে। মিস হুইলার ঐ ইটিং হোমের ওয়েট্রেস।

পুলিশকে মিস হুইলার বলেছে যে অফিসার ডেনিস রজার রেস্তরাঁয় এসে কফি ও ডুনাটের অর্ডার দেয়। অফিসার রজার এই রেস্তরাঁয় প্রায়ই আসে। ডুনাট ও কফি শেষ করে ডেনিস বললো তার ভীষণ মাথা ধরেছে এবং তার আলসারের ব্যথা উঠেছে। মিস হুইলার তাকে দু'টো অ্যাসপিরিন এবং এক চামচ বাইকারবেনট অফ সোডা দিয়েছিল। ডেনিস তারপর রেস্তরাঁয় অন্যান্য লোকগুলির দিকে সন্দেহজনক ভাবে চাইতে থাকে। তারা তখন আহারে ব্যস্ত ছিল। ডেনিস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, লোকগুলো আমার দুষমন।

মিস হুইলার বলতে যাচ্ছিল, তা কি করে হবে ? কিন্তু তার আগেই ডেনিস অতর্কিতে তার রিভলভার বার করে এগিয়ে গিয়ে সেই পাঁচ-

জনের কপালে গুলি করে তাদের হত্যা করে। মিস হুইলার ভয়ে ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচজনকে গুলি করে ডেনিস তার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'আই লাভ ইউ জুডি গারল্যাণ্ড' এবং পরমুহূর্তেই রিভলভারের নল নিজের মুখে পুরে ট্রিগার টিপে দেয়। সেইটেই ছিল শেষ বুলেট। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মিস হুইলারকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরে ছেড়ে দেয়। মৃত ব্যক্তিদের নাম জানা যায় নি।

নিউজরিলিজ পড়া হয়ে যাবার পরও খানিকক্ষণ সেটি পর্দায় রইলো। একটু পরেই পর্দার আলো নিভে গেল, লেখাও অদৃশ্য হলো। উইলিয়ম বুঝতে পারল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

উইলিয়ম তখনই নিউজরিলটি নিজের কথায় লিখে নিতে আরম্ভ করলো। লেখা শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বাজলো।

রিসিভার কানে দিতেই অপারেটর জিজ্ঞাসা করলো, আরিজোনা ব্রাশ রিজ থেকে ডঃ জেস উইলার্ড আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, লাইন দোব ?

হ্যাঁ, লাইন দাও।

উইলিয়ম হ্যালো বলবার আগেই ওপার থেকে মোটা গলায় প্রশ্ন, ওখানে কেউ কি আছে ?

আছে বই কি, আমি ডঃ উইলিয়ম ইয়ং কথা বলছি। তোমাদের একজন পেট্রলম্যান ডেনিস রজার সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাই, তুমি কি ডঃ জেস উইলার্ড ?

আমাদেব অপাবেটর বলছিল ঘটনাটাব সঙ্গে সবকাব নাকি জড়িত ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, আমি জানতে চাই···

শোনো ডঃ ইয়ং, আগে তোমার পবিচয় আমার জানা দরকার, তুমি কোথায় কাজ কর তাও বলতে হবে।

উইলিয়ম ভাবলো ডেনিসের ব্যাপারটা এখন পুলিশের হাতে অতএব ডাক্তার হয়তো সব কথা বলতে চাইবে না তবুও যতটুকু জানা যায়। অথচ উইলিয়ম নিজের পরিচয়ও দিতে পারে না।

ডঃ ইয়ং বললো, দেখ আমাব ও আমার প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে অসুবিধে

বোধছে অথচ আমার কিছু খবর দরকার এবং ব্যাপারটা জরুরী।

জরুরী হোক আর যাই হোক, তুমি কে বা কি, সে পরিচয় যদি না দাও তাহলে আমি আর দ্বিতীয় কথাটি বলবো না অতএব আমার সময় নষ্ট কোরো না।

শোনো ডঃ উইলার্ড, মাথা গরম করো না, কারণ…

আরে না না, আমি কিছুই বলব না।

না বললে তুমি অসুবিধেয় পড়বে এবং তখন আমার দোষ দিয়ো না, আমি এমন একটা গভর্ণমেণ্ট প্রজেক্ট থেকে কথা বলছি যার বিষয়ে কিছু প্রকাশ করা নিষেধ। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী এবং আমি ডেনিস রজার সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ তথ্য জানতে চাই। আমি জানি পুলিশ ইনকুয়ারি চলছে, পুলিশ তোমার কাছেও যাবে। ডেনিস যে নির্দোষ এবং স্বেচ্ছায় সে গুলি চালায় নি, তার মাথায় আকস্মিক কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল এসব হয়তো আমরা প্রমাণ করতে পারব, সে হয়তো বিশেষ কোনো রোগে ভুগছিল। এইসব জানবার জন্যেই তোমাকে ফোন করছি। অতএব ডাক্তার তুমি যদি কিছু না বল তাহলে সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে তোমার বারো বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আমি যা বললুম তা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এখন আমার কথার উত্তর দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছে।

শোনো ডঃ ইয়ং অত ক্ষেপে যেয়ো না, আমিও সরকারী চাকরি করি, নিয়ম কানুন আমিও জানি সেজন্যে আমাকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যাই হোক তোমার পজিশন বুঝলুম, কি জানতে চাও বলো, আমি দেখি তার উত্তর দিতে পারবো কি না।

ঠিক আছে, ডেনিসের কি আলসার ছিল?

আলসার? মানে স্টম্যাক আলসার? না। তবে ডেনিস নিজে তাই বলতো। আমি যতদূর জানি তার আলসার ছিল না।

তার অন্য কোনো অসুখ ছিল?

ডায়াবেটিস ছিল, ডাঃ উইলার্ড উত্তর দিল।

ডায়াবেটিস? ঠিক জানো?

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগে যখন তার বয়স তিরিশ তখন রোগ ধরা পড়েছিল, রোগ তখন বেড়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক দিন ওকে পঞ্চাশ ইউনিট ইনসুলিন দেবার কথা কিন্তু সে নিয়মিত ইঞ্জেকশন নিত না ফলে তাকে দু'একবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ও বলতো ইঞ্জেকশন নিয়ে কি হবে? আমরা তাকে ভয় দেখাই যে চিকিৎসা না করালে তাকে বরখাস্ত করা হবে, তাছাড়া তোমার পেটে অ্যাসিড জমবে, তুমি ভুগতেই থাকবে এবং শীঘ্রই মারা যাবে তখন সে রাজি হয় এবং গত তিন বছর ধরে নিয়মিত ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিচ্ছিলো।

তুমি সঠিক খবর দিচ্ছ তো? কারণ এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমি তো যতদূর জানি তোমাকে সঠিক খবরই দিলুম তবে শুনেছি ঐ রেস্তরাঁর ওয়েট্রেস ন্যানসি পুলিশকে নাকি বলেছে যে ডেনিস ড্রিংক করেছিল, ওর মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল অথচ আমি জানি ডেনিস কখনও ড্রিংক করতো না, সিগারেটও খেত না, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপ্রাণ ছিল তাই সে মাঝে মাঝে অনুযোগ করতো তার কেন ডায়াবেটিস হলো?

ডঃ ইয়ং যেমন আশা করছিল সেইরকম উত্তরই পাচ্ছে। সমস্যার সমাধান হয়তো শীঘ্র হবে।

একটা শেষ প্রশ্ন ডাঃ উইলার্ড, মৃত্যুর দিন ডেনিস কি মেলোটাউনের ভেতর দিয়ে ড্রাইভ করে গিয়েছিল?

হ্যাঁ গিয়েছিল, তবে সেদিন সে কিছু লেট করেছিল। সে তার হেডকোয়ার্টারে অয়ারলেস মারফত খবর দিয়েছিল। এটা জানতে চাইছ কেন? ওখানে কিছু সায়েন্টিফিক টেস্ট করা হচ্ছিলো নাকি?

না সেসব কিছু নয়, উইলিয়ম উত্তর দিল কিন্তু মনে মনে বুঝলো ডাক্তার তার কথা মেনে নিচ্ছে না।

শোনো ডঃ ইয়ং ডেনিসের কেসটা সিরিয়স যদিও সে বিচারের বাইরে চলে গেছে তথাপি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন আমদের সহজে ছাড়বে না অতএব তুমি যদি আমাদের সাহায্য কর তো ভাল হয়।

নিশ্চয়, নতুন কিছু হলে তোমাকে জানাব। উইলিয়ম ফোন ছেড়ে দিল। ফোন নামিয়ে রেখে উইলিয়ম তখনই এডিসন ইনস্টিটিউটের এক্সিকিউ-টিভ ডিরেকটরকে ফোন করলো। ডাক্তার উইলার্ডকে কিছুদিন আটকে রাখতে হবে। সে যতটুকু জানে ততটুকু যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, দু'দিন হলেই চলবে।

এক্সিকিউটিভ ডিরেকটর বললো, মিলিটারির সহায়তায় সে ডাক্তারকে আটচল্লিশ ঘণ্টা আটকে রাখতে পারবে।

উইলিয়ম ভাবছে লোকগুলোর হঠাৎ কেন মাথা খারাপ হয়ে গেল,সে প্রশ্নের জবাব সে বোধহয় শীঘ্রই দিতে পারবে। তার হাতে তিনটে কেস আছে। একজন ডায়াবেটিক রোগী যে মাঝে ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। পেটে অ্যাসিড। এবং তিন নম্বর রোগী একটি বেবি। একজন কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল আর বাকি দু'জন এখনও বেঁচে আছে। প্রথমজনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাকি দু'জনের মাথায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয় নি। পরস্পরের সঙ্গে একটা মিল আছে, একটা কমন লিংক পাওয়া যাবে।

অ্যাসিডোসিস, দ্রুত নিশ্বাস পতন, কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ, মাথা ঝিমঝিম, ক্লান্তি। কোনোভাবে একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে তাহলেই গ্রীন ব্যাকটিরিয়াকেও আয়ত্তে আনা যাবে।

কিন্তু ও কি? এমারজেন্সি বেল বাজলো না? হ্যাঁ, এমারজেন্সি বেলই তো? সাউণ্ড-প্রুফ ঘরগুলিতে জোর হলদে আলো জ্বলতে ও নিবতে লাগলো, এমারজেন্সির সংকেত।

উইলিয়ম শংকিত হয়ে উঠলো। সে প্রায় সমস্যার সমাধান করে ফেলে-ছিল, আর এমন সময় বাধা?

উইলিয়ম করিডরে বেরিয়ে এল। লাশকাটা ঘর 'অটোপসি' রুমে একটা বিপদ ঘটেছে। সর্বত্র 'অটোপসি লেখা একটা আলো জ্বলছে, নিবছে। জানিয়ে দিচ্ছে, সাবধান অটোপসি রুমে বিপদ ঘটেছে।

উইলিয়ম অনুমান করলো গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার জন্যে যে সতর্কতামূলক

ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যাতে কেউ মারাত্মক জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে না পারে তার জন্যে প্রতিপদে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তারই কোথাও কোনো চিড় ধরেছে। ওদেরই ভাষায় বলতে হয়, 'কি সীল ইজ ব্রোকেন'। এইজন্যেই এমারজেন্সি ঘণ্টা বাজছে, আলোর সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে। একটু পরেই অ্যামপ্লিফায়ার মারফত সারা বাড়িতে জানানো হলো "সিল হ্যাজ বিন ব্রোকেন ইন অটোপসি, সিল হ্যাজ বিন ব্রোকেন ইন অটোপসি। দিস ইজ অ্যান এমারজেন্সি।"

উইলিয়মের মহিলা সহকারী জেন গেনরও বেরিয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে? কে?

উইলিয়ম উত্তর দিল, আমার মনে হচ্ছে গ্যারি হাস্টন।

এখনও বেঁচে আছে তো?

আমি বলতে পারছি না, বলতে বলতে উইলিয়ম জোরে পা চালাতে লাগলো। জেনও ওর সঙ্গে চললো।

'মরফোলোজি' ঘর থেকে স্যাম চেসারও বেরিয়ে এসেছে। সেও ওদের সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটছে। লম্বা করিডর, গোল হয়ে ঘুরে গেছে। খানিকটা চলবার পর স্যাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। এমারজেন্সি জ্ঞাপক হল্‌দে আলো যেটা জ্বলছিল আর নিবছিল, চেসার সেই দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার পা দু'টো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

কি হলো? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো।

জেন বললো, মিঃ চেসার অসুস্থ হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।

উইলিয়ম লক্ষ্য করলো চেসারের হাত দু'টো ঝুলে পড়েছে আর সে যেন চোখ চেয়ে ঘুমোচ্ছে।

উইলিয়ম কাছে এসে ডাকলো, স্যাম কি হলো চলো, আমরা তোমার··· আর কিছু বলতে হলো না, উইলিয়ম বুঝতে পারলো কোনো কথা স্যামের কানে যাচ্ছে না। সে হল্‌দে আলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। উইলিয়ম স্যামের চোখের সামনে নিজের হাত নাড়লো কিন্তু স্যামের চোখের পাতা পড়লো না। উইলিমের মনে পড়লো এই ধরনের জ্বলছে নিবছে আলো স্যাম সর্বদা এড়িয়ে চলে। কতো ঠাট্টা করেছে

কিন্তু স্যাম শুধু হেসেছে

স্যামের কস বেয়ে লাল পড়ছে। উইলিয়ম বললো, জেন তুমি স্যামকে আড়াল করে দাঁড়াও যাতে না ও আলো দেখতে পায়। কিন্তু জেন স্যামের সামনে যেতে না যেতেই স্যাম পা মুড়ে মেঝেতে পড়ে গেল। সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, হাত পা কাঁপছে ক্রমে সারা দেহ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা চিৎকার করলো। তারপর মাথা ঠুকতে লাগলো। তার জামা-কাপড় আলগা করার সময় দেখা গেল তাব কোমরে একটা হল্‌দে দাগ ছড়িয়ে পড়ছে।

উইলিয়ম বললো, জেন তুমি ফার্মাসিতে চলে যাও একশো মিলিগ্রাম ফেনোবার্ব সিরিঞ্জে রেডি করে নিয়ে এস, অ্যালকোহল আর তুলো, ওকে ইঞ্জেকশন দোব। দরকার হলে পরে ডায়ালটিন দিতে হবে।

স্যাম চেসার শক্ত হয়ে শুয়ে আছে, চাপা গলায় কি বলছে। তবে একটু পবেই দেহ একটু শিথিল হলো আর সেই সুযোগে উইলিয়ম ওকে ঘুমপাড়ানি বাববিচুরেট ইঞ্জেকশন দিল।

জেন তুমি ওর কাছে থাক। ওর যদি আবার খেঁচুনি আরম্ভ হয় তবে আর এক ডোজ ইঞ্জেকশন দেবে তবে মনে হয় আর কিছু হবে না, ও ঘুমিয়ে পড়বে তবে ওকে নাড়াচাড়া কোরো না।

উইলিয়ম আর অপেক্ষা না করে 'অটোপসি' রুমের দিকে ছুটলো। সেই ঘর থেকেই বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছে।

অটোপসি রুমে পৌঁছে উইলিয়ম দরজা খোলবার চেষ্টা করলো কিন্তু দরজা খুললো না। কি করে খুলবে? দরজা তো বাইরে লক করে দেওয়া হয়েছে। অটোপসি রুম ও ভেতরে ল্যাবরেটরিও সংক্রমিত হয়েছে।

উইলিয়ম তখন মেন কণ্ট্রোল রুমে গিয়ে দেখলো ডঃ মারকাস ক্লোজ-সারকিট টি ভি মনিটর মারফত গ্যারি হাস্টনকে দেখছেন ও তার সঙ্গে কথা বলছেন!

গ্যারি ভীষণ ভয় পেয়েছে। মুখ সাদা, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, কথা বলতে পারছে না। সে ভাবছে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, যে-কোনো মুহূর্তে সে মরে যাবে।

ডঃ মারকাস বলছেন, ভয় পেয়ো না গ্যারি, তুমি মরলে এতক্ষণে মরে যেতে শান্ত হও, মনের জোর ফিরিয়ে আনো, আমরাও চেষ্টা করছি।

গ্যারি হাস্টন বললো, ও ক্রাইসট, আমি কোনো আশা দেখছি না…।

ঘাবড়াচ্ছো কেন গ্যারি আমরা জানতে পেরেছি বেশি অকসিজেনে গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার তেজ কমে যায়, আমরা তোমার ল্যাবরেটরিতে অক-সিজেন পাম্প করছি, পিওর অকসিজেন। আপাততঃ অকসিজেন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ডঃ মারকাস উইলিয়মকে বললেন, তুমি বুঝি সংকেত পেয়েই চলে এসেছ?

একটু দেরি হয়ে গেল, উইলিয়ম বললো, আমাদের সঙ্গে স্যাম চেসার আসতে আসতে হলুদে আলো দেখে ফিট হয়ে গেল, ওর বোধহয় এপি লেপসি আছে, আমি ওকে আপাততঃ ফেনোবার্ব ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। যেসব আলো জ্বলে নেবে সে সব আলোর দিকে ও চাইতে পারে না, ওর চোখে কেউ টর্চ জ্বাললে-নেবালে ও চটে যেত।

মারকাস বললেন, আমরা আপাততঃ গ্যারির ল্যাবরেটরির ভেতর পিওর অক্সিজেন পাম্প করছি। কতক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো জানি না তবে ওর ল্যাবরেটরির বাইরে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া বেরিয়ে আসতে পারে নি, ইনস্টিটিউটের বাকি অংশ এখনও নিরাপদ

উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো, কি করে এমন ঘটলো?

ঘটতেই পারে, কয়েকটা ল্যাবরেটরিতে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে অতএব কোথাও একটু ছিদ্র হলে এমন কাণ্ড তো ঘটতে পারেই।

তাহলে এটা কি একটা অ্যাকসিডেন্ট? উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো।

তা ছাড়া আর কি হতে পারে? আমরা তো সবরকম স্বাধীনতা অব-লম্বন করেছি। যে প্লাস্টিক স্যুট পরে তোমরা কাজ করছো তার কোথাও সূক্ষ্ম ছিদ্র হয়ে থাকতে পারে। এমন যে ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা আমার ছিল। আমরা এত রকম ধাপে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি যে তার হিসেব রাখাই মুশকিল, কোথায় কি ত্রুটি ঘটে যেতে পারে

কে বলতে পাবে ?

ডঃ মারকাসের যুক্তি উইলিয়ম মেনে নিতে পারছে না। তাদের প্লাস্টিক স্যুট এমন সকল পলিমার দিয়ে তৈরি যে তাতে ছিদ্র হওয়া অসম্ভব, তিন ইঞ্চি পুরু খাঁটি ইস্পাতে কোথাও ছিদ্র হবে তথাপি তাদের এই পাঁচ মিলিমিটার পুরু প্লাস্টিকে সূক্ষ্মতম ছিদ্র হওয়া অসম্ভব। যাই হোক যা হবার নয় তা যখন হয়েছেই তখন তার মোকাবিলা করতেই হবে।

ছিদ্র কেন হলো ? তার মাথায় তখন অন্য একটা চিন্তা এসেছে এবং সে যা অনুমান করছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে চরম সর্বনাশ সমুপস্থিত।

উইলিয়ম গ্যারি হাস্টনের দিকে চেয়ে দেখলো। বেচারা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে।

উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করলো, সীল কখন ভেঙেছে, ক'টার সময় সংক্রমণ হয়েছে ?

ডঃ মারকাস বললেন, ঐ দেখ স্টপক্লক, সীল ভাঙলেই অটোম্যাটিক স্টপক্লক বন্ধ হবে। চার মিনিট আটত্রিশ সেকেণ্ড।

তাহলে গ্যারি এখনও বেঁচে আছে, অকসিজেন দিচ্ছ বটে কিন্তু শুধুই কি অকসিজেন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ?

গ্যারি হাস্টন কাঁচের পার্টিশনের ওপার থেকে বললো, শুনছো, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো ? কিছু একটা কর।

নিশ্চয় কিছু করবো কিন্তু তোমার কোনো প্রস্তাব আছে ?

ক্যালোসিন দাও, গ্যারি বললো।

ক্যালোসিন ? নেভার। ডঃ মারকাসের চোয়াল শক্ত হলো।

কেন নয়, আমার জীবন তার ওপর নির্ভর করছে ?

কতক্ষণের জন্যে নির্ভর করবে গ্যারি, না, ক্যালোসিন আমি দোব না

কেন দোব না, তা কি তুমি জান না ?

উইলিয়মও বললো, গ্যারি যখন বলছে তখন ··।

না উইলিয়ম, ক্যালোসিন দিলে আমরা বরঞ্চ তাকে আরও তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দোব। তুমি কি ক্যালোসিনের বিষয় কিছু জান না ?

জানি তবে সব জানি না।

ক্যালোসিন আবিষ্কার হয়েছে পঁচিশ বছর আগে। এই আবিষ্কার কুড়ি বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। তারপর কিছু কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে তাও কয়েকজন মাত্র চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। ক্যালোসিন সম্বন্ধে আগাগোড়া যারা কিছু জানেন তাদের মধ্যে ডঃ নরমান মারকাস একজন। গ্যারি হাস্টনও কিছু জানে কারণ ওকে কয়েকটা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছিল।

ওষুধ তিলে তিলে ক্রসবি ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়। আমেরিকার সর্ব-বৃহৎ কেমিক্যাল ও ড্রাগ ফ্যাক্টরি ডু পণ্ট প্রতিষ্ঠানেরই একটা বিভাগ। এই বিভাগ শুধু ওষুধই তৈরি করে। ওষুধটির প্রথমে কোনো নামকরণ করা হয় নি, একটা সাংকাতিক নাম দেওয়া হয়েছিল, ডি পি সি—৫০ পরে শুধু সি ৫০। এই আবিষ্কারের মূলে ছিল দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ আচার্য এবং ডঃ সুব্বারাও। ডঃ আচার্য বাঙালী কিন্তু মার্কিনরা নাম দুটো স্রেফ চেপে গিয়েছিল।

সেটা অন্য কাহিনী।

ইঁদুর, বানর, কুকুর ও বেড়ালের ওপর প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে সি-৫০ জীবের বৃদ্ধি রোধ করে। যে জীবের ওপর এই ভেষজ প্রয়োগ করা হলো, সে জীব আর বাড়ছে না। বিপজ্জনক ব্যাপার। আর পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা চললো, রাসায়নিক গঠন ভেঙে চুরমার করে অন্য গঠন তৈরি হলো। নতুন ভেষজ আশ্চর্য আবিষ্কার বলে পরিগণিত হলো। বিজ্ঞানীরা উল্লসিত।

ভাইরাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার কোনো ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয় নি কিন্তু দেখা গেল সি-৫০ ভাইরাস জয় করেছে। ক্যানসার ও লিউকিমিয়া থামিয়ে দিতে লাগলো। আরও পরীক্ষা চললো, ফরমুলাও বদলাতে লাগলো। ইঁদুর, বানর, কুকুর ও বেড়ালের ওপর পরীক্ষা চললো। তবে বানরের ওপরেই পরীক্ষাটা বেশি কারণ মানুষ ও বানরের দৈহিক গঠন ও শারীরিক ক্রিয়া একই।

পরীক্ষা করে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেল। ক্যানসার, লিউকেমিয়া,

পোলিও, রেবিজ সবই সেরে যাচ্ছে। শরীরের ভেতরে বা বাইরে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাস সবই নির্মূল করে দিতে লাগলো। আশ্চর্য আবিষ্কার। ক্রসবি ল্যাবরেটরি উল্লসিত, ব্যাধিকে তারা পরাজিত করতে পেরেছে।

সি-৫০-এর নতুন নাম দেওয়া হলো ক্যালোসিন। ওষুধের ফরমুলা ও গুণাগুণ জানিয়ে পরীক্ষার জন্যে কয়েকটি সরকারী হাসপাতালে ক্যালোসিন পাঠানো হলো। পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগেই ক্যালোসিনের সব বিবরণী পড়েই এবং নিজের ল্যাবরেটরিতে কয়েকটা পরীক্ষা করে ডঃ মারকাস জোর দাবি করলেন যে এই ওষুধ অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। কিন্তু তখন তাঁর প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাত করলো না।

১৯৭২ সালে বাতিল করা কুড়িজন ক্যানসার রোগীকে এবং একটা বড় জেলখানার কুড়িজন বিভিন্ন ধরনের রোগীকে বেছে নেওয়া হলো। এমন রোগী যাদের টারমিনাল কেস বলা হয় অর্থাৎ বাঁচবার আশা নেই।

এই চল্লিশজন রোগীকে প্রতিদিন একমাস ধরে ক্যালোসিন খাওয়ানো হতে থাকলো। অদ্ভুত ফল দেখা গেল। চিকিৎসকরা অবাক। তারপর তারা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বলে তাদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

কিন্তু কাউকে আর বাড়ি বা জেলখানায় ফিরতে হলো না। ওষুধ বন্ধ করার দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকে মারা গেল।

ডঃমারকাস গোড়াতেই এই কথা বলেছিলেন। শরীরে বহু ব্যাকটিরিয়া আছে তারা জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তারা না থাকলে জীবের মৃত্যু অবধারিত। পৃথিবীতে যত জীবাণু আছে তার মধ্যে মাত্র শতকরা তিন ভাগ জীবের পক্ষে হানিকর। মানুষের দেহের ভেতরে ও বাইরে কত রকম জীবাণুই না বাসা বেঁধে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেই সম্পর্কে আকস্মিক ছেদ পড়লে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। মানুষ ও জীবাণুর সঙ্গে যে ভারসাম্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেই মৃত্যু অবধারিত।

ঐ চল্লিশজন 'গিনিপিগ' হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যায় নি প্রত্যেকে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল। একজনের তো আপাদমস্তক ভীষণ ফুলে গেল। শরীরে অনেক সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা, ফুসফুস এত ফুলে গেল যে বেচারা দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

আর একজন রোগীর পাকস্থলীটা জীবাণুরা পুরো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেললো। আর একজনের ব্রেন ভাইরাসের আক্রমণে জেলির মতো গলে গেল।

ক্রসবি প্রতিষ্ঠান ক্যালোসিন নিয়ে নতুনভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করলো। ওরা ক্যালোসিন-আর নামে নতুন এক ক্যালোসিন তৈরি করলো। এই নতুন ওষুধ খাওয়াবার আগে রোগীকে কয়েকটি ওষুধ খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অভীষ্ট ফল পাওয়া গেল না।

গ্যারি হাস্টনের যুক্তি হলো মরতেই তো বসেছি তবে আর ক্যালোসিন দিতে আপত্তি কেন?

ডঃ মারকাস বললেন তুমি যে মরবেই কে বললে? ক্যালোসিন-আর-এ সাময়িক আরোগ্য হয় কিন্তু পরে অবধারিত মৃত্যু। আমি সে ঝুঁকি নিতে চাই না।

গ্যারি হাস্টন রেগে গেল, বললো তোমরা তো দিব্যি নিরাপদে রয়েছ তাই লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছো।

ডঃ মারকাস বললেন, আরে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো এখনও বেঁচে আছ অথচ মেলোটাউনের কেউ এতক্ষণ বাঁচে নি। অকসিজেন এখনও তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অকসিজেন গ্রীন ব্যাকটিরিয়াদের ঠেকিয়ে রাখছে, আমি মাঝে মাঝে অকসিজেন বন্ধ করে একটু একটু ওজোন গ্যাস অর্থাৎ ও-থ্রি ছাড়ছি।

ডঃ ইয়ংকে মারকাস বললেন, গ্যারি একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করছে, নিশ্বাস আস্তে পড়ছে এবং ভয়ও পেয়েছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা অঘটন ঘটতে পারে।

ডঃ নরমান মারকাস কি নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন? তিনি কি গ্যারিকে খরচের খাতায় লিখে দিয়ে নতুন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করবার মতলবে

আছেন ?

বিল তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ ?

আছে, আছে, একটা মতলব আছে।

ডঃ উইলিয়ম ইয়ং নিজের ল্যাববেটরিতে ফিরে গিয়ে কাঁচের পার্টিশনের ওপারে বৃদ্ধ হেজার ডেভিস ও বেবির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ভাবতে লাগলো। এদের দু'জনের মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই কিন্তু কি রহস্য সাক্ষাৎ মৃত্যুকে পরাজিত করলো ?

এই তো কয়েক মিনিট আগে সে ভেবেছিল রহস্যের সমাধান সে বুঝি করে ফেলেছে কিন্তু এখন দেখছে তার অনুমান ঠিক নয়। সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো। দু'হাতে বুক চেপে গ্যারি হাস্টন মরে যাচ্ছে। একা গ্যারি হাস্টন কেন ? তারা নিজেরাও মরে গেছে, লস এঞ্জেলস, স্যান ফ্রানসিসকো, চিকাগো, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ডেট্রয়েট, ডেনভার, বোস্টন সব বড় বড় শহরের রাস্তাগুলো নরনারীর মৃতদেহে ভরে গেছে, গাড়ি চালাতে চালাতে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে কত মানুষ মরে গেছে। আকাশ থেকে অ্যামেরিকার ওপর বিভীষিকা নেমে এসেছে, যারা তখনও বেঁচে আছে তারা প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কগ্রস্ত। উইলিয়ম আর ভাবতে পারছে না…।

সে নিজেও ভয় পেয়েছে। কিসের ভয় তা সে জানে না।

হাজার হোক নিজে তো পণ্ডিত মানুষ, নিজেকে সংযত করতে জানে। ক্রমশঃ সে তার চিন্তাগতকে ফিরে এল, ছিন্ন সূত্রগুলি পরপর গ্রথিত করতে লাগলো।

একটা সিকিউরিটি অফিসারের ডায়াবেটিস ছিল, নিয়মিত ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিত না। তার পেটে মাঝে মাঝে অ্যাসিড জমতো। বৃদ্ধ-লোকটি স্টার্নো পান করতো যার সঙ্গে মেথানল মিশ্রিত থাকায় তারও পেটে অ্যাসিড জমতো কিন্তু বেবিও ছিল স্বাভাবিক, তার পেটে তো অ্যাসিড জমতো না। পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়

নি। তথাপি সেদিন মেলোটাউনে যখন মৃত্যুদূত নেমে এসেছিল তখন কি তার পেটে অ্যাসিড জমেছিলো ? জমবার কারণ কি ?

যতই সে ভাবে ঘুরে ফিরে বেবি তার মাথায় আসে। বেবি কি করে বেঁচে গেল ?

ডঃ উইলিয়ম ইয়ং একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন।

উইলিয়ম ভাবতে লাগলো মানুষের পেটে প্রচুর অ্যাসিড জমে থাকলে কিংবা কাউকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইঞ্জেকশন দিলে সে মরে যেতে পারে কিন্তু সেই অবস্থায় সেই মানুষ যদি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে থাকে তাহলে তার নিশ্বাসের সঙ্গে কারবন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে এবং তার রক্তস্রোতে কারবন ডাইঅক্সাইড যে কারবনিক অ্যাসিড জমা করে থাকে তা হ্রাস পেতে থাকে এভাবে সেই মানুষ কিছু সময় বেচে থাকতে পারে, বেঁচে যেতেও পারে।

দ্রুত নিশ্বাস ফেললে শরীরের অ্যাসিড লেবেল কমে যেতে পারে।

হেজার ডেভিস এবং ডেনিস রজারের পাকস্থলীতে অ্যাসিডের আধিক্য ছিল কিন্তু বেবির তা নেই। উইলিয়ম বেবির দিকে দেখলো। বেবিও সেই সময়ে জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করলো। বেচারির মুখ লাল হয়ে গেছে, চোখ কখনও বুজছে কখনও খুলছে, দাঁতহীন মুখ কখনও খুলছে কখনও বন্ধ করছে।

গ্যারি হাস্টনের মতো বেবিরও কি মৃত্যুভয় ?

মেলোটাউনে শকুনিগুলোর কথা উইলিয়মের মনে পড়লো। শকুনিগুলো তো মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছিলো, একটাও তো মরে নি। পাখিগুলোর হৃদস্পন্দন দ্রুত। সেই দ্রুত হৃদস্পন্দন কি গ্রীন ব্যাকটিরিয়াকে শরীরে প্রবেশ করতে বা শরীরে প্রবেশ করলেও কোনোভাবে বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয় ? ব্যাপারটা কি এতই সহজ ? হতে পারে না।

উইলিয়ম বসে পড়লো। মাথা ধরেছে। চোখ রগড়ালো। হাই উঠছে। ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ব্রেন ঠিক কাজ করছে না। হাতে একদম সময় নেই। গ্যারিকে কি করে বাঁচানো যায়। গ্যারি স্থানুর মতো বসে আছে। গ্যারিও শেষ মুহূর্তগুলি লিখে রাখছে না কেন ?

দূর তোর, ছাই যা হবার তাই হবে। যা অবস্থা ওরা সবাই বোধহয় মরবে। দারুণ টেনশন। সে আর কিছুই ভাবতে পারছে না।

টিভি স্ক্রীনে কি লেখা যেন ভেসে উঠলো কিন্তু উইলিয়মের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে ভাবছে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

এমন সময় তার সহকারী জেন গেনর এসে খবর দিল, ডঃ স্যাম চেসাবকে আমরা আমাদের হসপিটালের বেডে নিয়ে গেছি।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

উইলিয়ম যেন নিজের মধ্যে নেই। তাকে যেন কেউ চালাচ্ছে। সেই যেন তাকে স্যামের কাছে যেতে বললো অথচ এখন স্যামের কাছে না গেলেও চলে কারণ স্যাম তো ভালোই আছে। বারবিচ্যুরেট ইঞ্জেকশন দেবার পর সে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কি ব্যাপাব ঘটছে সে কিছু জানে না।

জেন জিজ্ঞাসা করলো ডাইলানটিন দোব নাকি ?

একটু অপেক্ষা করা যাক। ফেনোবার্ব তো পড়েছে, ওতেই কাজ হবে মনে হচ্ছে।

স্যাম চেসাবকে উইলিয়ম পরীক্ষা করলো। তার নাড়ীব গতি দেখলো। চোখ দেখলো, আরও কি সব দেখতে লাগলো।

জেন জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঘুমোবার সময় পার হয়েছে তাবওপব গ্যারির প্রাণসংশয়। দারুণ টেনশন।

উইলিয়মের মনে পড়লো তারা যখন এই সময় নিজের নিজের শহরে থাকতো তখন সে ও গ্যারি এই সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতো। ওবা দু'জনেই এক্সপ্রেসওয়ের লেন বেছে নিত। সে রাস্তায় সকলেই অন্ততঃ ৬৫ মাইল স্পিডে গাড়ি চালায়। গাড়ির ভিড় কম থাকলে ৪৫ মাইল পর্যন্ত নামাতে পারে তবে গাড়ির গতি কেউ কমায় না, কমাতে পারে না বরঞ্চ ওদিকে ঘণ্টায় ৬৫ মাইল অতিক্রম করে যায়।

গাড়ির এই কম গতি আর দ্রুত গতি যেন একটা মজা…। আরে এই হ্রাস ও দ্রুত গতির মধ্যে সে যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছে।

আমি তো একটা মূর্খ।

চেসারকে ফেলে রেখে সে তার কমপিউটারের দিকে ছুটলো।
কমপিউটারের সাহায্যে উইলিয়ম কি হিসেব আরম্ভ করলো। হিসেব করতে করতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। শরীরে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হলে গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধি তথা বিষক্রিয়া উৎপাদনের হার কমে যায়।
ফলাফলে সে উল্লসিত। সে জেন গেনরকে বললো, বিপদ বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পারবো।
কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

ওদিকে মেন কণ্ট্রোল রুম থেকে ডঃ মারকাস টেলিভিসন পর্দার মাধ্যমে গ্যারি হাস্টনের প্রতি নজর রাখছে। উইলিয়ম সেখানে আসতেই মারকাস বললো, অকসিজেন চলছে।
অকসিজেন চলছে ?
উইলিয়ম বললো, অকসিজেন বন্ধ কর।
বন্ধ করবো কি ? ডঃ মারকাস বিস্মিত।
হ্যাঁ, ওকে এখন ঘরের স্বাভাবিক হাওয়া নিতে দাও।
উইলিয়ম টিভি পর্দায় গ্যারিকে দেখতে লাগলো। উইলিয়মের মনে হলো গ্যারি বোধহয় আর অকসিজেন নিতে পারছে না। তার নিশ্বাসের পতন স্বাভাবিক হচ্ছে না, গতি যেন ধীর, বুক আস্তে ওঠানামা করছে।
উইলিয়ম মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলো, গ্যারি আমি এইমাত্র কমপিউটরে একটা টেস্ট ও ক্যালকুলেশন করে আসছি। রক্তে অ্যাসিড ও অ্যালকালির পরিমাণের ওপর গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার কাজ নির্ভর করে। অ্যাসিড বা অ্যালকালি বেশি হলে গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার কাজ কমে যায়। তুমি শরীরে রক্তের অ্যালকালি বাড়াও, তাড়াতাড়ি নিশ্বাস নাও।
গ্যারি বললো, ঘরে তো পিওর অকসিজেন। আমার মাথা একটু ঝিম ঝিম করছে তাছাড়া আমি কতক্ষণ জোরে নিশ্বাস নিতে পারব ? কি সব বাজে কথা বলছো ?

শোনো, আমরা অকসিজেন ও সামান্য পরিমাণে ওজোন যা দেওয়া হয়েছিল তা বন্ধ করে দিলুম। এখন শুদ্ধ বাতাস ছাড়ছি, এবার তুমি দ্রুত নিশ্বাস নিতে পারবে।

তারপর ডঃ মারকাসের দিকে ফিরে বললো, নরম্যান ঘরের মধ্যে একটু কার্বন ডাইঅকসাইড ছাড়ো।

কিন্তু বিল কার্বন ডাইঅকসাইড গ্রীন ব্যাকটিরিয়া তীব্র হয়ে উঠবে।

জানি কিন্তু রক্তে যদি অ্যালকালি বাড়ে তাহলে তা হবে না, গ্যারির রক্তে অ্যালকালি বাড়াতে হবে।

ডঃ মারকাস বুঝি বিলের কথার সূত্র ধরতে পেরে বললেন, তাই বুঝি বেবির অম্বল হলে কাঁদে।

তাই।

আর বুড়োর অ্যাসিড বাড়ে অ্যাসপিরিন গিলে?

তার ওপর স্টার্নো গেলে, বিল বললো, দু'জনের রক্তে অ্যাসিড আর অ্যালকালি ওদের গ্রীন ব্যাকটিরিয়া থেকে রক্ষা করছে। আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম হেজার ডেভিসের পেটে অ্যাসিডের চৌবাচ্ছা তাকে গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে কিন্তু বেবি? তার স্টম্যাকে তো অ্যাসিড নেই কিন্তু বেবিদের স্টম্যাকে অ্যালকালি জমে।

মাইক্রোফোনে মুখ রেখে ডঃ মারকাস গ্যারিকে বললো, আমরা বিশুদ্ধ বাতাস আর কিছু কার্বন ডাইঅকসাইড ছাড়ছি। তুমি জোরে নিশ্বাস নাও, ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইঅকসাইড বার করো। কি রকম মনে হচ্ছে?

গ্যারি হাস্টন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, ও কে···একটু ভয় করছে বটে তবে ও কে।

গুড

মাইক্রোফোন থেকে মুখ সরিয়ে ডঃ মারকাস উইলিয়মকে বললো, বিল আমরা এভাবে গ্যারিকে কতক্ষণ টিকিয়ে রাখতে পারবো? গ্রীন ব্যাকটিরিয়াগুলো সাক্ষাৎ ডেভিল তারা কি সহজে ছেড়ে দেবে?

সে তো নিশ্চয়, তথাপি চেষ্টা করতে হবে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,

ওর রক্তে অ্যালকালির পরিমাণ বাড়ানো হোক।

উইলিয়ম মাইক্রোফোনে মুখ দিয়ে গ্যারি হাস্টনকে বললো, দেখ তো গ্যারি তোমার ল্যাবরেটরির শেলফে কিছু পাও কিনা যাতে তোমার ব্লাডের অ্যালকালিটি বাড়ানো যায়।

গ্যারি বসে বসেই চারদিক চেয়ে বলল, নাহে সেরকম তো কিছু দেখছি না।

উঠেই একবার দেখ না, বাইকার্বনেট অফ সোডা, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এমন কি ভিনিগার ?

গ্যারি উঠে ল্যাবরেটরির শেকল এমন কি আলমারিও দেখলো কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। প্রায় সবই নানা ধরনের কেমিক্যাল রি-এজেন্ট অর্গানিক কেমিক্যাল ও স্টেন। ঘাড় নেড়ে বললো, না, নেই।

উইলিয়ম ইতিমধ্যে গ্যারির নিশ্বাস পতন গুণছিল, মিনিটে পঁয়ত্রিশ ; বেশ জোর আছে। এভাবে নিশ্বাস ফেললে অনেকক্ষণ চালাতে পারবে। কিন্তু অনেকক্ষণ মানে কতক্ষণ? কিন্তু এক সময়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়বে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে।

ল্যাবরেটরির ভেতরে খাঁচায় একটা ইঁদুর ছিল। উইলিয়মের সেদিকে নজর পড়লো। ইঁদুর বেশ বসে গ্যারিকে মিটমিট করে দেখছে। সেটা যে অসুস্থ তা বোঝা যাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্বাস নিচ্ছে। উইলিয়ামের দৃষ্টি অনুসরণ করে নরম্যান মারকাসের দৃষ্টিও ইঁদুরের দিকে পড়লো।

আরে ইঁদুরটা · মারকাস বললেন।

গ্যারি হাস্টন বিপদে পড়েছে এই খবর জানিয়ে আলো ও শব্দসংকেত মারফত জরুরী সংকেত থেমে গিয়েছিল কিন্তু আলো ও শব্দ আর একটা বিপদ-সংকেত জানিয়ে দিল।

কয়েক জায়গায় পিভিসি ও প্ল্যাস্টিক কেবল্ ক্ষয়ে যাচ্ছে।

সর্বনাশ! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। এমন হতে থাকলে তো সমস্ত ইনস্টিটিউটের কাজ অচল হয়ে যাবে। এ আবার কি নতুন বিপদ! এমন

কি করে হলো ?

ঘটনাটা ঠিক কি না যাচাই করবার জন্যে দু'জনেই কমপিউটারের কাছে ছুটলো।

খবর নির্ভুল বরঞ্চ সংকট আরও বেশি। মারকাস বললো, সামথিং ইজ রং, ভেরি রং। ওরা দু'জনের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। এখন কি করা যাবে। এই বিপদ থেকে এখনি কি করে মুক্তি পাওয়া যাবে ?

গ্যারির কথা ওরা ভুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোন মারফত বিল্ডিংয়ের সমস্ত টেকনিসিয়ান ও এঞ্জিনিয়ারদের বলে দেওয়া হলো প্রতিটি পয়েন্ট চেক করো।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে স্যাম চেসার, হেজার ডেভিস, বেবি এবং গ্যারির বা বাইরে যারা আছে তাদের শারীরিক অবস্থার কারও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তবে কতক্ষণ এই অবস্থা চলবে কে বলতে পারে। ইনস্টিটিউটের সব পিভিসি এবং প্ল্যাস্টিক ক্ষইতে আরম্ভ করেছে কিন্তু সেগুলি যদি নষ্ট হয়ে যায়, গলে যায় তাহলে তো সবকিছু কোলাপস্ করে যাবে।

ডঃ মারকাস ও ডঃ উইলিয়মের মুখে প্রশ্ন কেন এমন হচ্ছে ? চরম বিপদ ঘনিয়ে আসছে অথচ যে লোকটির এতক্ষণে মারা যাওয়ার কথা সে এখনও বেঁচে আছে কেন ?

কেনর উত্তরটা ডঃ মারকাসের মাথায় আসবার আগে ডঃ উইলিয়মের মাথায় আগে এসে গেল।

উইলিয়ম বললো, আমরা বড়ো বড়ো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করি, ছোট ব্যাপার মাথায় আসে না। আমার মনে হচ্ছে কি জান নরম্যান ?

কি মনে হচ্ছে বিল ?

গ্রীন ব্যাকটিরিয়াগুলোর মিউটেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, ওদের আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে, নতুন পরিবেশে ওরা নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে এবং এই জন্যেই ওরা ওদের তীব্র বিষক্রিয়া হারিয়ে ফেলছে। এখনও যেগুলোর মধ্যে মিউটেশন আরম্ভ হয় নি সেগুলো পিভিসি নষ্ট করছে অথবা কোনোভাবে ছাড়া পেলে মানুষকে

আক্রমণ করবে।

ঠিক বলেছ বিল, চল তো আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখি, আমার কাছে কয়েকটা পেট্রিডিশে বিভিন্ন মিডিয়াতে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া আছে।

হাতে কলমে যে কাজ মানুষের সম্পন্ন করতে কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে, কমপিউটবের সাহায্যে সে কাজ কয়েক মিনিটে করা যায়।

ওরা দুজনে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই কমপিউটরের সাহায্যে বিভিন্ন পেট্রি ডিশের বিভিন্ন মিডিয়া থেকে যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার নমুনা তুলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে অবাক।

এখন ওদের আর ডেভিল ট্র্যাঙ্গল বলা চলবে না। ওরা এখন যুক্ত হয়ে ছয় কোণ অর্থাৎ হেক্সাগোনাল হয়ে গেছে। ওদের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। আরও পরীক্ষা দরকার কিন্তু সময় নেই। তবুও তার মধ্যে জানতে হবে এই মিউটেশনের জন্যে দায়ী কে? এবং অবিলম্বে পিভিসি ক্ষয়ও বন্ধ করতে হবে নচেৎ শেষ রক্ষা করা যাবে না।

উইলিয়ম ইয়ং বললো, নরম্যান এরোপ্লেন অ্যাকসিডেন্টটা একবার মনে কর তো? পাইলট বলেছিল রবারের সব কিছু গলে যাচ্ছে। সেই এরোপ্লেন মেলোটাউনের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সেই সময় নিশ্চয় গ্রীন ব্যাকটিরিয়া সেই প্লেনে ঢুকে পড়েছিল।

ডঃ মারকাস বললেন, তাহলে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া প্লেনের যাত্রীদের আগে মারলো না কেন?

আমার মনে হয় আমাদের আকাশের বায়ুমণ্ডলের কোনো গ্যাস গ্রীন মণ্ডলের আকৃতি, প্রকৃতি ও চরিত্র বদলে দিয়েছিল। সেই পরিবর্তিত ব্যাকটিরিয়া মানুষ মারবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু পলিমার নষ্ট করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিল।

ডঃ মারকাস প্রশ্ন করলেন, তাহলে বিল বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাস গ্রীন ব্যাকটিরিয়ার মিউটেশনের জন্যে দায়ী সেই গ্যাস তাহলে আমাদের ল্যাবরেটরিতেও আছে।

আছে বলছো কি নরম্যান? সেই গ্যাস তো তুমি গ্যারি হাস্টনের চেম্বারে

অকসিজেন দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পাঠাচ্ছিলে।

ও-থি? ওজোন গ্যাস? বলতে পারছি না ওজোন এই মিউটেশনের জন্যে দায়ী কি না. পরীক্ষা করতে হবে কিন্তু ওদিকে পিভিসি ও পলিমার যে গলতে আরম্ভ করেছে তা বন্ধ করা যায় কি করে?

সমস্ত বিলডিংটাতে ঘনীভূত ওজোন গ্যাস ছেড়ে দেখ, আমার মনে হয়, তাহলে গ্রীন ব্যাকটিরিয়া বা হেক্সাগোনাল ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘনীভূত ওজোন তৈরি করতে পারব কি না বলতে পারছি না, কাঁচামালের স্টক কি রকম আছে…।

এমন সময় আবার এমারজেন্সি ঘণ্টা বেজে উঠলো। এবার সংকেত আরও সাংঘাতিক। যেন রুশ বোমারু বিমান ও রকেট অতর্কিতে এক-যোগে নিউ ইয়র্কের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ আরম্ভ করেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমেরিকা আত্মসমর্পণ না করলে রাশিয়া অ্যাটম বোমা ফেলবে।

এমারজেন্সি ঘণ্টা বাজা থামার সঙ্গে সঙ্গে এডিসন ইনস্টিটিউটের সব কটা অ্যামপ্লিফায়ার যেন গর্জে উঠলো:

তিন নম্বর লেভেল সংক্রমিত।
খাঁচার সমস্ত ইঁদুর ও তিনজন
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মৃত।
তিন নম্বর লেভেল সীল করা হয়েছে।

সংকেত শুনেই নরম্যান মারকাস এবং উইলিয়ম ইয়ং ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল। দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেছে।

পিভিসি এবং পলিমারের কেবল্ ও অন্যান্য ফিটিং গলে যাওয়া যদি অবিলম্বে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে সংক্রমণ সমস্ত ইনস্টিটিউটে ছড়িয়ে পড়বে।

ডঃ মারকাস বললো তাহলে সমস্ত ত্রিকোণ গ্রীন ব্যাকটিরিয়া এখনও ষড়কোণ হয়ে যায় নি। বিল তুমি এক কাজ কর, যেটুকু ওজোন গ্যাস পাও সেটুকু তুমি তিন নম্বর লেভেলে ছাড়তে আরম্ভ কর আর আমি খবরটা ভ্যাণ্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স স্টেশনে আর্থার ওয়ালেসকে রেডিও

মারফত জানিয়ে দিই।

তাড়াতাড়ি কর, রেডিও না বিকল হয়ে যায়। তারপর আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে যে কোনো মুহূর্তে বেরোবার পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভাগ্যক্রমে লিফটের কেবল্‌গুলো এখনও নষ্ট হয় নি।

লিফটের কেবল্ স্টীলরোপের।

ডঃ মারকাস পোর্টেবল ট্রান্সমিটার অ্যাডজাস্ট করে ভ্যাণ্ডেনবার্গে এস ও এস বার্তা পাঠালেন। ভ্যাণ্ডেনবার্গ তিনশত মাইল দূরে। তারা এমারজেন্সি সাহায্য পাঠাচ্ছে কিন্তু কিছু সময় তো লাগবেই।

ট্রান্সমিটারে এস ও এস বার্তা পাঠানো শেষ হতে না হতেই লাউডস্পিকার ঘোষণা করলো, এই লেভেল বন্ধ, বেরোবার পথও বন্ধ।

মারকাস ও উইলিয়ম হতভম্ব। তাহলে কি সাফল্যের দরজায় এসে সব শেষ। ডেভিল ট্র্যাঙ্গি গ্রীন ব্যাকটিরিয়া এখন ছয়কোণা হয়ে গেছে এবং তার বিষদাঁতও ভেঙে গেছে। অন্য লেভেলে যে কটা গ্রীন ব্যাকটিরিয়া আছে সে কটাও দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

উইলিয়ম বললো, একবার শেষ চেষ্টা। আমরা সবাই গ্যাস মাস্ক পরি, কোনো গ্যাস ছাড়া হোক যাতে গ্রীন বা হেকসাগোনাল সমস্ত ব্যাকটিরিয়া মরে যায়।

তা করা যায় বটে বিলু কিন্তু আমাদের বিভিন্ন গ্যাসের সিলিণ্ডারগুলো যে স্টোররুমে আছে সেই স্টোররুমে যাবার পথ তো বন্ধ হয়ে গেল।

তাহলে কি আমরা এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মরবো? আমাদের সব বিদ্যা এতদিনের সব সাধনা সব নিষ্ফল…।

ঐ শোনো বিল।

ডঃ উইলিয়ম ইয়ং এবং ডঃ নরম্যান মারকাস দু'জনেই এবং এডিসন ইনস্টিটিউটের সকলে কান খাড়া করে শুনলো লাউডস্পিকারের জরুরী ঘোষণা।

নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটতে আর তিন মিনিট বাকি।

সর্ব নিম্নতলে যেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার যন্ত্র বসানো

আছে সেখানে বিশেষ একটা মিটারে যদি গ্রান ব্যাকটিরিয়াব অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেটে যাবে।

লাউডস্পিকারে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজতে আরম্ভ করলো। এই সাইরেন হলো সর্বশেষ সংকেত। তিন মিনিট পরে বিস্ফোরণ ঘটবে যারা ভগবানে বিশ্বাসী তাবা প্রার্থনা আরম্ভ কর বাঁচবার আব কোনো আশা নেই।

ডঃ মারকাস ও ড: ইয়ং-এব সাহস তুলনাহীন। স্থির মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তারা অবিচল। এখনও দু'মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড সময় হাতে আছে। আপাতত ড: মারকাস অকসিজেন এবং ওজোন গ্যাসেব চাপ বাড়িয়ে দিলেন। অবিশ্বাস্য কিছু ঘটে যেতেও পারে।

একটি মাত্র আশা আছে বাঁচবাব। উইলিয়ম ইয়ং হলো কি-ম্যান। তারকাছে একটি চাবি আছে আর অপরটি আছে ড: মারকাসের কাছে তারা দু'জনে বিস্ফোবণ বন্ধ করতে পারেন।

কিন্তু মুশকিল হলো হাতে যেটুকু সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে ওরা কি-রুমে কি করে পৌঁছবেন? অতর্কিত এমন বিপদ ওরা কেউ আশা করেন নি।

লাউডস্পিকাবের ঘোষণা এবং সাইরেনেব আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। যারা কথা বলছে তাব স্বর অত্যন্ত মৃদু আব যারা প্রার্থনা করছে তারা নীরবে প্রভুকে স্মরণ করছে।

নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটবার ঠিক দশ সেকেণ্ড আগে সমস্ত বিলডিং ঘন ও তীব্র সায়ানাইড গ্যাসে ভরিয়ে দেওয়া হবে তাতে বিস্ফোরণ ঘটবার আগেই সকলের মৃত্যু হবে।

ব্যবস্থা বানচাল করা যায়। বিলের কাছে যে চাবি আছে সেই চাবি ঘুরিয়ে বিস্ফোরণ বন্ধ করা যাবে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটানো বন্ধ করা যাবে না। এমন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা আছে যে বোমা ফাটবেই এবং সমস্ত বাড়িটা এমনভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যে তার কোনো চিহ্নই থাকবে না।

এখন আর ঘণ্টার ব্যাপার নয়, মিনিটের ব্যাপার তাও হাতে আছে

আর মাত্র দু'মিনিটের কিছু বেশি সময়।

লাউডস্পিকার ঘোষণা করলো বিস্ফোরণ ঘটতে দু'মিনিট দশ সেকেণ্ড বাকি আছে।

উইলিয়ম ইয়ং বললো, দেখা যাচ্ছে মৃত্যু অবধারিত অতএব এক কাজ করা যাক, আমরা গ্যারিকে ওর চেম্বার থেকে বার করে এনে সকলে স্যাম চেসারের কাছে যাই, আমরা এক সঙ্গেই মারা যাব।

তাই কর, গ্যারিকে বার করে নিয়ে এস। দুঃখের বিষয় যে শেষে এখানে কি ঘটলো তা কেউ জানতে পারবে না, আমাদের সঙ্গে সমস্ত রেকর্ড ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি যাও গ্যারিকে বার করে নিয়ে এস আমি দেখি ট্রান্সমিটার মারফত ভ্যাণ্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি কি না।

উইলিয়ম ছুটলো গ্যারিকে তার চেম্বার থেকে বার করে আনতে আর ডঃ মারকাস ট্রান্সমিটার নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করলেন কিন্তু হায়, ট্রান্স-মিটার বিকল, কোনো সাড়া নেই, ডেড।

উইলিয়ম হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে বললো গ্যারি তার চেম্বারে নেই।

নেই? সে কি? কোথায় গেল? ডঃ মারকাস বিস্মিত।

লাউডস্পিকার ঘোষণা করলো বিস্ফারণ ঘটতে ষাট সেকেণ্ড বাকি

উইলিয়ম বললো, সব গেল আর রক্ষা করা গেল না।

ডঃ মারকাস বললেন, আশ্চর্য যে আমাদের ব্রেন এখনও কাজ করছে, আমরা এখনও নিরাশ হই নি। বিল একটা উপায় আছে, ঐ দেখ ঐ ব্লু বালবটার নিচে একটা লাল তার গেছে, চল আমিও যাই। ঐ লাল তারটা কেটে দিতে পারলে কিন্তু নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ রোধ করা যাবে না। তুমি তারটা কাটতে পারবে?

পারবো, বলেই উইলিয়ম তার পকেট থেকে একটা নেলকাটার বার করলো। এই নেল কাটারের সঙ্গে ছোট অথচ ধারালো একটা ছুরি এবং একটা টিন ও বটল ওপনার লাগানো থাকে। উইলিয়ম নেলকাটারের ছুরিখানা খুললো।

লাউডস্পিকার ঘোষণা করলো বিস্ফোরণ ঘটতে আর পঞ্চাশ সেকেণ্ড

বাকি।

উইলিয়ম আঙুল দিয়ে ছুরিটার ধার পরীক্ষা করে সরু লাল তারটা কুচ করে কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফিস্ করে মৃদু একটা আওয়াজ হলো, যেন ফুটবলের ব্লাডার থেকে বাতাস বেরিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল।

উইলিয়ম তুমি কোথায়? ড: মারকাস জিজ্ঞাসা করলেন। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডঃ মারকাস এবং এডিসন ইনস্টিটিউ-টের সকল কর্মী অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভ্যাণ্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স স্টেশন থেকে দ্রুত বিমানে রিলিফ পার্টি আসতে দেরি হয়নি। তবে আর একটু দেরি হলে একজন ব্যতীত আর কাউকে বোধহয় বাঁচানো সম্ভব হতো না সকলে অকসিজেনের অভাবে মারা যেত।

যাকে বাঁচানো যায় নি তাঁর নাম ড: উইলিয়ম ইয়ং। তাঁর সমস্ত দেহটা ছাই হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক চুল্লিতে মানুষের মৃতদেহ যেমন ছাই হয়ে যায় সেইরকম। এমন কি করে হলো সে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু ড: উইলিয়ম ইয়ং নিজের জীবনের বিনিময়ে সকলের জীবন দান করে শহীদ হলেন।

কিন্তু গ্যার হাস্টনের কোনো খবর পাওয়া গেল না।